কন্যাপক্ষ

কন্যাপক্ষ

বিমল মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ:
৭ই শ্রাবণ ১৩৪১

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা
কার্তিক ১৩৬১

তৃতীয় মুদ্রণ, ৩৩০০ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৬২

চতুর্থ মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৬২

পঞ্চম মুদ্রণ, ৩৩০০ সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৬৩

ষষ্ঠ মুদ্রণ, ৩৩০০ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

সপ্তম মুদ্রণ, ২২০০ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা:
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর: শ্রীঅজিত ঘোষ, শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী,
৬৪।এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

শ্রীশিবদাস চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

'কন্যাপক্ষ' উপন্যাস নয়। উপন্যাসের প্রচলিত যা সংজ্ঞা তার আওতায় এ পড়ে না। কিন্তু ছোটগল্পের বই-ও নয় এ। কেন নয়, তা বুঝিয়ে বলা দরকার। সব কিছু জড়িয়ে যে সামগ্রিক এক অখণ্ড আবেদন উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ, এ-গ্রন্থে তা আছে।

এ-ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে কিছু বিচিত্র চরিত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম আমি। সচেতনভাবে চিত্রশিল্পীদের মতো তার কিছু স্কেচ করে রেখেছিলাম তখন উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ পটভূমিকায় এগুলো বৃহত্তর প্রয়োজনে লাগাবো। কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন তার ভেতরে ঐক্য, সামঞ্জস্য আর ক্রম-পরিণতির এক আভাস লক্ষ্য করেছি। তাই সেগুলির কিছু অংশ একত্র করে এখন গ্রন্থাকারে রূপ দিলাম। তা ছাড়া আমার সাহিত্য-জীবনের একটি পুরনো অধ্যায় হিসেবেও আমার কাছে এর উপযোগিতা আছে।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৬১

বিমল মিত্র

লেখক জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, তাকে সারা জীবন ধরে লিখতে হবে এবং আজীবন ভালো লেখাই লিখতে হবে। একখানা ভালো বই লিখে থেমে গেলে চলবে না। একখানা ভালো বই লিখেছে বলে, পরের বইটা খারাপ লিখলেও কেউ তাকে ক্ষমা করবে না। শুধু ভালো লিখতে হবে তাই-ই নয়। আরো ভালো। আরো, আরো ভালো। উত্তরোত্তর ভালো

এ-সব কথা আমার নয়। এত কথা আমি বুঝতাম না। এ-সব কথা আমাকে যে শিখিয়েছিল, তাকে আমার গল্পের মধ্যে কখনও টেনে আনিনি। আমার জীবনের শেষ গল্প আমি লিখবো হয়ত তাকে নিয়েই। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্

কিন্তু কাকে নিয়ে 'কন্যাপক্ষ' সুরু করি!

অলকা পাল, সুধা সেন, মিষ্টিদিদি, মিছরি-বৌদি, আমার মাসিমা, কালোজামদিদি, মিলি মল্লিক—কার কথা ভালো করে জানি! কাকে ভালো করে চিনেছি! আমার জীবনের সঙ্গে কে জড়িয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে বেশি করে। ছোটবেলা থেকে কত জায়গায় তো ঘুরেছি। কত কিছু দেখেছি। সকলকে কি মনে রাখা সহজ! জব্বলপুরের সেই নেপিয়ার টাউন, বিলাসপুরের শনিচরী বাজার, কলকাতার সেই হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে মিষ্টিদিদির বাড়ি, পলাশপুরের মিলি মল্লিক—কত জায়গায় কত লোককে দেখলাম, আমার নোট-বইতে সকলের সব গল্প লিখে রাখিনি। শুধু দু'একটা টুকরো-টাকরা টুকি-টাকি স্কেচ্ সব, তাই নিয়েই এই 'কন্যাপক্ষ'।

সোনাদি বলতো, 'যা-কিছু দেখছিস টুকে রাখ্। আর্টিস্টরা যেমন স্কেচ্ করে খাতায়, তেমনি করে, তারপর যখন উপন্যাস লিখবি তখন কাজে লাগবে তোর।'

উপন্যাসের কাজে কোনদিন লাগবে কিনা জানি না, তবু অনেকদিন ধরে যেখানে যা-কিছু দেখেছি, তার কিছু কিছু লিখে রেখেছি। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর যেন এক-একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি। এক-একজন মানুষ যেন এক-একটা তাজমহল। তেমনি সুন্দর, তেমনি বিস্ময়-মুখর, তেমনি অশ্রু-করুণ!

ইচ্ছে ছিল, একদিন একখানা উপন্যাস লিখবো। এমন উপন্যাস যে, পৃথিবীর সব মানুষ তাদের নিজের ছায়া দেখতে পাবে তাতে। অসংখ্য চরিত্রের শোভাযাত্রা। হাজার হাজার মানুষের মর্মকথা মুখর হয়ে উঠবে সে-উপন্যাসে। সে হবে দ্বিতীয় মহাভারত। সে আশা আমার সার্থক হয়নি জানি। হবেও না। তবু সোনাদি আশা দিতো, 'কেন পারবি না তুই, নিশ্চয় পারবি—নগদ পাওনার লোভ যদি ত্যাগ করতে পারিস, পুরুত হয়ে পুজোর নৈবিদ্য যদি চুরি না করিস তো, একদিন দেবতার প্রসাদ পাবি তুই নিশ্চয়ই।'

মনে আছে, ছোটবেলায় একমাত্র সোনাদির কাছেই যা-কিছু উৎসাহ পেয়েছি। যখন লুকিয়ে লুকিয়ে লিখে পাতা ভরিয়ে ফেলেছি, বাবা দেখতে পেয়ে রাগ করেছেন, বন্ধু-বান্ধবরাও ঠাট্টা করেছে—তখনও কিন্তু সোনাদি হাসেনি!

সোনাদি বলতো, 'মেয়েদের নিয়ে লেখাই শক্ত, মেয়েদেরই ভালো করে লক্ষ্য করবি। মেয়েরা যেন ঠিক মঙ্গলগ্রহের মতো, এত দূরে থাকে তবু তার সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কৌতূহলের আর শেষ নেই। মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুবার জন্যে কি মানুষের কম চেষ্টা, কম অধ্যবসায়। কিন্তু যদি কখনও পৌঁছুতে পারে সেখানে—'

জিগ্যেস করতাম, 'পৌঁছুলে কী দেখবে, সোনাদি?'

'তা কি বলতে পারি! কেউ হয়তো ঠকবে, কেউ জিতবে। হারজিত নিয়েই তো জগৎ। কিন্তু যে-মানুষের দূরত্ব নেই, তার সম্বন্ধে কোনো মানুষের কোনো কৌতূহলও আর নেই। মেয়েদের রহস্যময়ী করে সৃষ্টি করার কারণই তো তাই—'

কিন্তু সুধা সেনকে যখন প্রথম দেখি তখন সত্যিই কোনো কৌতূহল, কোনো রহস্য আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই পরে যখন একদিন সুধা সেনের চিঠি পেলাম, সেদিন সত্যিই চম্‌কে উঠেছিলাম।

মনে আছে সুধা সেনকে নিয়ে যেদিন প্রথম রাস্তায় বেরিয়েছিলাম নিজেরই কেমন লজ্জা হয়েছিল যেন। সুধা সেন এমন মেয়ে নয় যাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনো চলে।

ট্রাম-রাস্তার মোড়ে কারো সঙ্গে দেখা হয়, এটা ইচ্ছে ছিল না আমার সেদিন। সুধা সেন তেমন মেয়ে নয়, যাকে সঙ্গে করে বেড়ালে লোকের ঈর্ষার উদ্রেক করা যায়। বরং উল্‌টো। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন রোগা স্বাস্থ্যহীন কেমন করে হল ? কাঁধ-ঢাকা ব্লাউজের বাইরে হাত দুটোর যে অংশ নজরে পড়ে, সেখানে সৌন্দর্যের আভা কি যৌবনের মাধুর্য এতটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না! গলার দু'পাশে কণ্ঠার হাড় দুটো স্পষ্ট-উচ্চারিত উদ্ধত ভঙ্গিতে আত্মঘোষণা করে। চোখের যে-দৃষ্টি থাকলে অন্তত যুবতী বলে মনের নিভৃতেও একটু চাঞ্চল্য জাগে, তাও নেই তার।

সে-দৃশ্যটা আজো আমার মনে আছে। সুধা যেন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েই দাঁড়িয়েছে আমার বাঁ-পাশে। হাতে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগও আছে, পায়ে মাঝারি দামের স্যাণ্ডেলও আছে, হাতে চুড়িও আছে দু'গাছা করে। সিঁদুরের একটা টিপও দিয়েছে সুধা সেন দুটো ভুরুর মধ্যে। একটা জমকালো রঙিন শাড়িও পরেছে। অর্থাৎ সাজবার দুর্দম স্পৃহা না থাক্, তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুধা সেন সেজেছে।

সুতরাং এমন একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে চলতে সেদিন লজ্জাই হচ্ছিল মনে আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থাতেই কি মোহিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হয়!

এড়ানো সম্ভব হলে হয়ত এড়িয়েই যেতাম। কিন্তু মোহিতই আমায় দেখে ফেলেছে। এগিয়ে এসে বললে, 'কী রে, কোথায় ?'

বললাম, 'একটা উপকার করতে পারো হে ?'

তারপর সুধা সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার বৌদির বিশেষ জানাশোনা, বড় মুশকিলে পড়েছেন। থাকবার একটা ঘরের বিশেষ দরকার। মেয়েদের বোর্ডিং, না হয় মেস্, যেখানে হোক। একেবারে যাকে বলে নিরাশ্রয়। একটা বাসার খবর দিতে পারো ?'

মোহিত নানা কাজের মানুষ। নানা দরকারে নানা জায়গায় যেতে হয় তাকে। বার দুই সিগারেটে টান দিলে। কপাল কুঁচকে একবার ভাবলেও যেন। তারপর বললে, 'আপাতত তো কিছু মনে পড়ছে না ভাই, তবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ একবার চেষ্টা করে ছাখো না—'

চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি নেই। মোট কথা আজকের মধ্যে যেখানে হোক একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করতেই হবে। সুধা সেনকে আমারই হাতে ছেড়ে দিয়েছে বৌদি। সুধা সেনের একটা থাকবার ব্যবস্থা আজ না করলেই নয়। এই বিরাট কলকাতা শহরে সুধা সেন নাকি একেবারে সহায়-হীনা। আজ রাতটুকুর জন্যেও মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই তার কোথাও।

সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলাম। ভারি অসহায় মনে হল তাকে। কে জানে এতদিন এই স্বাস্থ্য দিয়ে বি. এ. পাস করেছে কেমন করে, কেমন করে সাপ্লাই অফিসের অ্যাকাউন্টস্ সেক্সনে আশি টাকা মাইনের চাকরি করছে। পাড়াগাঁয়ে নাকি ছোটবেলায় মানুষ। ছোটবেলায় মানে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে দেশেই। বৌদি বলে, 'ভীষণ কিপ্‌টে মেয়েটা, কিছুতেই পয়সা খরচ করবে না, দিন ভোর শুধু সাত-আট বার চা খেয়েই কাটায়।'

ট্রাম এসে গিয়েছিল।

মোহিত বললে, 'হ্যাঁ, আর একটা জায়গা মনে পড়েছে, গোয়াবাগানে মেয়েদের একটা বোর্ডিং আছে, সেখানে একবার চেষ্টা করতে পারো, বোধ হয় জায়গা পেতেও পারো—'

ট্রামে উঠে পকেট থেকে নোট-বইটা বার করে ঠিকানাটা লিখে রাখলাম। কোথায় বালিগঞ্জ, কোথায় গোয়াবাগান, কোথায় হ্যারিসন রোড। শেষে যদি কোথাও জায়গা না মেলে তখন আমার কী কর্তব্য ভেবে পেলাম না। কিন্তু সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলে সত্যিই মায়া হয়।

বৌদি বলে, 'অফিসে একদিনও কিছু খাবে না, নেহাত যখন খুব খিদে পাবে তখন খালি এককাপ চা—তাই তো ওইরকম স্বাস্থ্য।'

একটা বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। জানালার দিক ঘেঁষে সুধা সেন বসেছিল।

বললাম, 'বৌদি বলছিল, আপনার এক ভাই থাকে কলকাতায়—'

সুধা সেন বললে, 'এক ভাই নয়, দু'ভাই—দু'জনে দু'বাসায় থাকে।'

'আপনার আপন ভাই? তা সেখানে তাদের কাছে কোনরকমে—'

সুধা সেন বাইরের দিকে চোখ রেখেই বললে, 'আমার টিউশানিটা যাবার পর থেকে তো ভায়েদের কাছেই আছি।'

'আপনি টিউশানি করতেন নাকি?'

সুধা সেন বললে, 'সেইখানেই তো এ ক'বছর কাটিয়েছি, আমার স্যুটকেসটা এখনও সেখানে সেই বাসাতেই পড়ে আছে। একটা ছোট ছেলেকে পড়াতে হত। তাঁরা নোটিস দিলেন। ছেলে বড় হয়েছে, এবার পুরুষ টিচারের কাছে পড়বে। লোক তাঁরা খুব ভালো। আমাকে এক মাসের নোটিস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—এক মাসের মধ্যে কোথাও একটা বাসা-টাসা খুঁজে নিতে।'

'তারপর?'

'একটা মাস তো দেখতে দেখতে কেটে গেল। একখানা ঘর পাওয়া গেল না যে, তা নয়। কিন্তু মেয়েদের থাকবার মতো সে-ঘর নয়। আর, এক-একজন যা ভাড়া চেয়ে বসলো! আমি তো আশি টাকা মাইনে পাই, তা থেকে দেশে মাকেই বা কী পাঠাই, আর নিজের খরচই বা কিসে চালাই!'

কল্পনা করলুম, সুধা সেন সারাদিন অফিসের চাকরি করে সকালে-সন্ধ্যেয় ছাত্র পড়িয়ে বাসা খুঁজতে বেরিয়েছে। শ্যামবাজার, বউবাজার, টালা আর টালিগঞ্জ। যেখানে এতটুকু পরিচয়ের সূত্র আছে, সেখানেই সন্ধান নেওয়া। তারপর ট্রামের ভিড়। সে-ভিড়ে পুরুষ মানুষেরাই উঠতে পারে না তো সুধা সেন তো চেপ্‌টে যাবে। একটা আচমকা ধাক্কা খেয়েই

তো উল্‌টে পড়বে রাস্তায়। হয়তো ধাক্কাও খেয়েছে অনেকদিন। সৌন্দর্যের আভিজাত্য থাকলে লোকে তবু একটু সম্ভ্রম সমীহ করে। খাতির করে। সুধা সেনের সে সুবিধেও নেই। এই তো সেদিন দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে যাবার সময় একজনের চোখের সান-গ্লাসটা ছিট্‌কে রাস্তায় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। কতবার রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে যে-সব অত্যাচার অপমান সইতে হয়েছে, সে-সব কি আর সুধা সেন মুখ ফুটে বলবে ?

বললাম, 'ধরুন, আজ যদি কোনো ব্যবস্থা না হয়, তাহলে কী উপায় ?'

'তা হলে ?—' বলে ভাবতে লাগলো সুধা সেন।

'আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন আমার। আপনি নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, আপনার বৌদির কাছে শুনেছি আপনার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে।'—সুধা সেন আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে।

লেডিস্‌ সীটে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মহিলা ওঠায় জায়গা ছেড়ে দাঁড়াতে হল। আমি যেন বাঁচলাম।

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছট্‌ফটে মেয়েটা। কেবল এ-অফিস থেকে সে-অফিস করবে। কেবল কিসে উন্নতি করবে, বেশি টাকা জমাবে সেই ইচ্ছে—মোটে খাবে না কিছু, পয়সা যেন ওর গায়ের রক্ত।'

সুধা সেনের পাশে যে মেয়েটি এসে বসলো সে পাঞ্জাবী। সুধা সেন তার পাশে যেন এতটুকু বিন্দুবৎ হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি সুধা সেনকে দেখে মায়া হয় না, দুঃখ হয় না। হাসি পায়। সাপ্লাই অফিসের অন্য মেয়েদেরও তো দেখেছি। অনেক বিবাহিতা মহিলা, পাঁচ-ছ' ছেলের মা, অনেকেই তো চাকরি করে। আবার কারোর চাকরি করবার প্রয়োজন নেই, শুধু শখ, তাও দেখেছি। সাজগোজ পোশাক-পরিচ্ছদ, সেই পয়সায় সিনেমা-থিয়েটার রেস্টুরেন্ট সবই চলে। ধর্মতলার খাবারের দোকানটাতে দুপুরবেলা মেয়েদের ভিড়ে ঢোকাই যায় না। কিন্তু সুধা সেনের মতো মেয়ে সত্যিই দেখা যায়নি এর আগে। এত রোগা মেয়ে আগে নজরেও পড়েনি আমার। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন স্বাস্থ্যহীন কেমন করে

হল। সুধা সেন যখন হাঁটে, তখন মনে হয় সে যেন তার কানের পাতলা দুটো দুলের মত টিকটিক করে দুলছে। হাঁটছে তাকে বলা চলে না ঠিক।

দু'জনের দুটো টিকিট আমিই কিনেছিলাম। কিন্তু সুধা সেনের সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। টিকিট কেনা হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন তার মনে উঠতে পারে না।

ধর্মতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নামতে হল। আর একটা ট্রামে উঠতে হবে এখানে।

শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে বললাম, 'কোথায় আগে যাবেন? গোয়াবাগানে, না পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ?'

সুধা সেন বললে, 'চলুন আগে শেয়ালদ'য়। আমার ছোড়দা ওখানে থাকে শুনেছি।'

বললাম, 'আর আপনার বড়দা? তিনি কোথায় থাকেন?'

সুধা সেন বললে, 'সেই বড়দার বাড়িতেই তো রাত্রে শুই, কিন্তু সেখানেও রাত বারটায় আগে ঢোকবার হুকুম নেই, তারপর ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে-থাকতে সকলের ঘুম থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে চলে আসতে হয়।'

'কেন?' সুধা সেনের কথা শুনে অবাক্ হবারই কথা।

সুধা সেন যা বললে, তা শুনে আরো অবাক্ হয়ে গেলাম। সুধার বড়দা ফড়েপুকুরে বিয়ে করে বউ নিয়ে সংসার পেতেছে। সেখানে থাকবার জায়গাও আছে বেশ। একখানা ঘর খালি পড়েই থাকে। ভারি ভালমানুষ কিন্তু বড়দা। কারো মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। কতদিন বড়দা সুধা সেনের অফিসে এসে আগে আগে খবর নিয়ে যেত। টাকার সাহায্য অবশ্য সুধা সেনের প্রয়োজন হয় না। তবু বৌদি কিছুতেই সুধা সেনকে সেখানে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু বড়দা খুব ভালবাসে ছোট বোনকে। যখন বৌদি ঘুমিয়ে পড়ে, রাত বারটার পর বড়দা চুপি চুপি দরজা খুলে দিয়ে যায়। নিঃশব্দে, আলো না জ্বেলে সুধা সেন তার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আবার সকালবেলাই সকলের আগে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে হয় রাস্তায়।

বললাম, 'তারপর স্নান খাওয়া, এসব ?'

সুধা সেন বললে, 'স্নানটা এতদিন ছোড়দার ওখানেই করতুম। বউ-বাজারে একটা মেস করে আছে ছোড়দারা কয়েকজন বন্ধু মিলে···ওরা এতদিন আপত্তি করে আসছিল। সকালবেলা সবাই অফিস যাবে, আর আমি তখন কলঘর জোড়া করে থাকি—সকলের বড় অসুবিধে হয়।'

বললাম, 'শোয়া, স্নান করা তো হল—এরপর খাওয়া ?'

'খাওয়ার আর ভাবনা কি ? না খেলেই হয় !' সুধা সেন হাসলে।

বৌদি ঠিকই বলেছে,—মেয়েটা ভারি কিপ্‌টে। কিছু খাবে না, খাবে কেবল চা। কাপের পর কাপ চা। নইলে খুব খিদে আছে। যদি খায় তো বড় জোর সিঙ্গাড়া, কচুরি, নয় তো বেগুনি, ফুলুরি তেলেভাজা। এই তেলেভাজা খেয়েই এক-একদিন কাটিয়ে দেয় সুধা সেন। এক-একদিন স্রেফ কিছুই খায় না। প্রথম প্রথম নাকি কষ্ট হত সুধা সেনের, কিন্তু আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। বড়দার বাড়িতে রাত বারটার আগে ঢোকবার হুকুম নেই, অথচ অফিস ছুটি পাঁচটায়। এই সাত ঘণ্টা কাটাতেই বড় কষ্ট হয়। কার্জন পার্কের জনবহুল অংশটায় কাটানোই সবচেয়ে নিরাপদ। কিংবা ট্রামে চড়ে একবার ডালহৌসি আর একবার বালিগঞ্জ স্টেশনও করা যায়, কিন্তু অকারণে অনেকগুলো পয়সা খরচ। কার্জন-পার্কের খোলা হাওয়ায় ঘাসের ওপর বসে দু'পয়সার চিনেবাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে পেটটাও ভরে, খোলা হাওয়া খাওয়াও হয়, আবার সময়টাও বিনা খরচে কাটানো যায়।

সুধা সেন বললে, 'বড়দা ছোড়দা কেউ মাকে টাকা পাঠায় না। সেখানে আমার একটা ছোট ভাই আছে, আমাকেই তার খরচ দিতে হয়।'

বড়দা নাকি বিয়ের আগে টাকা পাঠাতো। কিন্তু ইদানীং বৌদি বারণ করে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ির কোন লোককে দেখতে পারে না বৌদি। ছোড়দা তো দাদার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছে—সুধা সেন বাধ্য হয়েই রাত্রে যায় শুতে, নইলে বৌদি দেখতে পেলে বড়দাকে তো আর আস্ত রাখবে না।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়দার মেসটা ছিল এতদিন, তবু সকালবেলা কাপড়-কাচা, স্নান করাটা হচ্ছিল। কিন্তু দু'দিন থেকে তাও হয়নি—আজ দু'দিন স্নান করাও হয়নি আমার।'

'কেন?'

'ছোড়দা ও-মেস ছেড়ে দিয়ে শেয়ালদ'য় একটা বড় হোটেলে উঠেছে। সেই জন্যেই বলছিলুম, আগে শেয়ালদ'য় গিয়ে ছোড়দার খোঁজটা করি—'

শেষ পর্যন্ত শেয়ালদ'র মোড়েই ট্রাম থেকে নামলাম। সুধা সেনকে নিয়ে এখানে ঢুকতে কেমন যেন লজ্জা ও সংকোচ বোধ হল।

ম্যানেজার কিন্তু চিনতে পারলেন না। বললেন, 'অমলেন্দু সেন? না মশাই, এখানে ও-নামে কেউ থাকে না।'

সুধা সেন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। অথচ সে ছোড়দার মেসে গিয়ে শুনেছে, এখানেই উঠেছে ছোড়দা।

আমি বললাম, 'এখানে কোনো ঘর পাওয়া যাবে, মানে আলাদা ঘর একটা, ইনি থাকবেন।'

ম্যানেজার সুধা সেনের দিকে চাইলেন। কেমন যেন বক্র-দৃষ্টি। অন্তত সুধা সেনকে কেউ বক্র-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে, এ-ধারণা আমার ছিল না। ইতিমধ্যে দু'একজন ওয়েটার, চাপরাসী, ক্যাশিয়ার তারাও এসে দাঁড়িয়েছে চারপাশে। সুধা সেন আর আমাকে জড়িয়ে সবাই মিলে যেন একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে। জিনিসটা আমার ভালো লাগলো না।

ক্যাশিয়ার বললে, 'কী বললেন স্যার, অমলেন্দু সেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিলেন এখানে তিনি, কিন্তু তিনি তো...আচ্ছা, ওইখানে দেখুন তো, পাশেই যে গলিটা, ওর শেষে একেবারে লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় বোধ হয় তিনি আছেন—ওই হোটেলে একবার চেষ্টা করে দেখুন তো—'

সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি পার হয়ে সুধা সেনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে যেন বাঁচলাম। আমার সম্বন্ধে কী ভাবলে ওরা কে জানে। ব্যাপারটা সুধা সেন বুঝতে পেরেছে নাকি? কিন্তু ওর মুখ

দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। তেমনি ভাষাহীন বিবর্ণ মুখ ওর। হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটি নিয়ে বেশ চঞ্চল পায়ে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলো সুধা সেন।

লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় ঢোকা গেল।

একটু নির্জন মনে হল বাড়িটা। ঘরগুলো তালাচাবি দেওয়া। ছুটির দিন। সবাই বোধ হয় যে-যার দেশে চলে গেছে। রান্নাঘরের কোণে ঠাকুর থালায় ভাত বেড়ে খাবার আয়োজন করছে।

বললে, 'অমলেন্দুবাবু? ওই সাত নম্বর ঘরে দেখুন।'

সাত নম্বর ঘর খুঁজতে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ঠিকানা বদলালো, অথচ বোনকে একটা খবর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেনি—এ যেন কেমন। সুধা সেন কি এখানে থাকতে পারবে? এ যেন হেটো মেস বলে মনে হল।

এক ভদ্রলোক ভিজে গামছা পরে এক বালতি জল বয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকেন, কিন্তু এখন তো তিনি নেই। সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন, আসবেন সেই রাত্রে, আবার না-ও আসতে পারেন। বলে গেছেন, ওবেলা খাবেন না।'

সুধা সেনের দিকে তাকালাম। সুধা সেনও আমার দিকে তাকালে। বুঝলাম—ছোড়দাকে পাবার আশা যেন সে করেনি। শুধু ছোড়দার আস্তানাটা চিনে রাখতেই এসেছিল। সুধা সেন নির্বিকারভাবে বেরিয়ে এল বাইরে। আমিও এলাম পেছনে পেছনে।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়দার দেখা পাওয়া যাবে না জানতাম—ও ছোটবেলা থেকেই ওমনি! দশ বছর বয়সে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, মাকে একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় না।'

শুনে আমি চুপ করে রইলাম।

সুধা সেন আবার বলতে লাগলো, 'বড়দার ওপরেই মার বেশি ভরসা ছিল। জমি-জায়গা বেচে বড়দাকে বাবা পড়িয়েছিলেন। আর বলতেন,—কমলটাই মানুষ হবে।'

বললাম, 'মানুষ তো যা হয়েছে, বুঝতে পারছি।'

সুধা সেন বললে, 'বড়দাই তো আমার পড়ার খরচ সব দিত, মাকেও টাকা পাঠাতো, কিন্তু বৌদি আসার পর থেকেই সব বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকেও বৌদি মোটে দেখতে পারে না। বড়দা এই ব্যাগটা আমায় কিনে দিয়েছিল আমার জন্মদিনে।'

বললাম, 'এবার তাহলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিংটা দেখা যাক—'

সুধা সেনকে নিয়েই আজ সমস্তটা দিন কাটবে মনে হল। অথচ রাস্তার মধ্যে ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। কোথাও একরাত্রির জন্যেও যদি থাকবার একটা বন্দোবস্ত করা যেত আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অফিসে যে-সব মেয়েরা সুধা সেনের সঙ্গে কাজ করে তারাও কী আশ্রয় দেন না একে। কে জানে সুধা সেনের কোথায় গোলযোগ। নিশ্চয় একটা খুঁত আছে কোথাও সুধা সেনের চরিত্রে, যা তাকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের কাছে থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম। বৌদি বলেছিল, 'বড় কিপ্‌টে মেয়েটা, না-খেয়ে ওর মতো থাকতে আর কাউকে দেখিনি।'

কিন্তু কৃপণতা কি এতবড় একটা অপরাধ নাকি যে কারো সহানুভূতি ভালোবাসা বন্ধুত্ব পাবে না। যে কৃপণতা করে সে তো নিজেকেই কষ্ট দেয়, নিজেরই স্বাস্থ্য নষ্ট করে। তাতে আর কার কী এসে গেল। নাকি একসঙ্গে এক ঘরে বাস করতে গেলে কুড়িয়ে ছড়িয়ে না থাকলে কারোর সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায় না। কমলেন্দুকে মানুষ করতে সুধা সেনের মা যে-পরিমাণ অর্থ আর সম্পত্তি ব্যয় করেছেন, সেটা থাকলে আজ বোধ হয় সুধা সেন অন্যরকম হত। বোধ হয় সুধা সেন পেট ভরে খেত। বোধ হয় তার স্বাস্থ্য এমন নির্জীব হত না। হয়ত সুধা সেনকে বি. এ. পাস করতেও হত না, চাকরি করতেও হত না। বিয়ে করে দেশের আর পাঁচজন মেয়ের মতো সংসার পাততে পারতো।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ বড্ড কড়াকড়ি।

দোতলার ভিজিটার্স রুমে অনেক টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ। সেখানেই বসলাম দু'জনে। ঘরে আরো অনেক ছেলেমেয়ে গল্প করছে। সুপারি-

ন্টেণ্ডেণ্ট-এর নাকি অসুখ, তিনি নিচে নামবেন না। আমি বসে রইলাম, সুধা সেনই ওপরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সুধা সেন খানিক পরে আবার সেই নির্বিকার মুখ নিয়েই ফিরে এল।

বললে, 'হল না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম আবার।

তারপর? তারপর কী? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম। কাঁটা ঘুরে একেবারে তিনটের ঘরে চলে এসেছে। এখনও কিন্তু সুধা সেনের খিদে পাবে না। অন্তত খাবার কথার উল্লেখ না করলে আর খাবার কথা বলবে না সুধা সেন। ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়েছি। আমার যেন আর নড়তে ইচ্ছে করছে না। সুধা সেন কিন্তু অক্লান্ত। মনে হল এখনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমনি অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরি চালিয়ে যেতে পারবে। সুধা সেনের দিকে চাইলাম। বললাম, 'তারপর?'

সুধা সেনও আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তারপর কী বলুন?'

তারপর যেন আর সত্যিই কিছু করবার নেই। যেন এখানেই এসে পূর্ণচ্ছেদে পরিসমাপ্তি। আর চলবে না চাকা। এখানেই নামতে হবে শেষবারের মতো। এরপর শুধু ধূসর হতাশা!

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছট্‌ফটে মেয়ে. আর বড্ড একগুঁয়ে, যা নিয়ে লাগবে তা শেষ পর্যন্ত করে ছাড়বে, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, অদ্ভুত গোঁ ওর!'

শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আসুন, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

আপত্তি করলে না সুধা সেন। বললে, 'চলুন।'

একটা ভালো রেস্তোরাঁ দেখে ঢোকা হল। ঘরময় লোক। সুধা সেনকে নিয়ে ঢুকতেই চারিদিক থেকে দৃষ্টি পড়লো আমাদের ওপর। কোনও পরিচিত লোকের দৃষ্টিকেই ভয় ছিল, নইলে আর অসুবিধে কিসের। সুধা সেনকে নিয়ে যে-কোনো লোকের বিব্রত হবারই কথা। সুধা সেনের চেহারাই এমন, তার ওপর নজর না পড়ে উপায় নেই।

কোনো রকমে সুধা সেনকে নিয়ে একটা কেবিনের মধ্যে ঢুকেছি। পর্দাটা অর্ধেক টেনে দিলাম।

কোনো মেয়ে যে একজন পুরুষের সামনে অমন গোগ্রাসে খেতে পারে, সুধা সেনকে সেদিন কেবিনের মধ্যে খেতে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না সত্যি। নাকি সকালে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত কিছুই খায়নি। হয়তো হাতে পয়সা নেই। সেই কোন্ সকালে বড়দার বাড়ি থেকে বৌদি জাগবার আগেই বেরিয়ে এসেছে, তারপর দোকান থেকে কি আর এক কাপ চা-ও খায়নি। আমাদের বাড়িতে যখন সুধা সেন এল তখন সাড়ে দশটা সকাল। তারপর এখন তিনটে বিকেল। সত্যি সুধা সেনের ক্ষমতা আছে। সুধা সেন নিজের মনেই খাচ্ছে, আর আমি অপাঙ্গে তাই দেখছি। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত মুমূর্ষু ভিখিরির আহার দেখেছি, সে এক রকম। কিন্তু এই সুধা সেনের খাওয়া! বি. এ. পাস, প্রাইভেটে এম. এ. দেবে, শিক্ষিতা মেয়ের এই আহার যেমন কদর্য তেমনি কুৎসিত। সমস্ত মন আমার বিষাক্ত হয়ে উঠলো। তিন টাকা বিলের দাম চুকিয়ে দিলাম নিঃশব্দে।

বললাম, 'উঠুন।'

আরো বোধ হয় খেতে পারতো সুধা সেন। সুধা সেন যেন আজ সাত দিনের খাওয়া একদিনে খাবে বলে মনস্থ করেছে। রাস্তায় বেরিয়েই কিন্তু করুণা হল। পরিমাণে যে খুব বেশি খেয়েছে সুধা সেন, তা নয়, কিন্তু তার খাওয়ার ভঙ্গিটাই যেন বড় বিশ্রী লেগেছিল সেদিন।

যেন খানিকটা শক্তি পেয়েছে সুধা সেন। বললে, 'চলুন, একবার গোয়াবাগানে শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

মোহিতের দেওয়া ঠিকানাটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নোট-বুকে লেখা ছিল। এবার শেষ চেষ্টা। হাতে আর আশ্রয়ের সন্ধান নেই। এবারেও যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে নিরুপায়। সুধা সেনকে বললাম, 'ট্রামে উঠুন তাহলে—'

কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে গোয়াবাগান দশ মিনিটের রাস্তা। ট্রামে খুব ভিড়। কিন্তু কেন জানি না লোকজন সুধা সেনকে দেখেই রাস্তা করে

দিলে। লেডীজ্ সীট ভর্তি ছিল। একজন পুরুষ যাত্রী সুধা সেনের জন্যে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুধা সেনের কৃশ শরীর দেখে দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হল, ভিড়ের মধ্যে সুধা সেনকে ছেড়ে দিয়ে যাব নাকি পালিয়ে। না হয় খুঁজে মরুক নিজের আশ্রয়। গোটাকতক পয়সা খরচ হোক সুধা সেনের। তারপর, লেখাপড়া জানা মেয়ে—রাস্তায় আর রাত কাটাতে হবে না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কোনো রকমে রাস্তায় কাটিয়ে তারপর আশ্রয় নিক্ গিয়ে বড়দার বাড়িতে নিত্যকার মতো। সুধা সেনের বড়দা লোক ভালো, তিনি ঠিক রাত বারোটার সময় স্ত্রীর অজ্ঞাতে দরজার খিল খুলে দেবেন। আমার কিসের মাথাব্যথা! আমার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে আমি কেন মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি সুধা সেনের পেছনে পেছনে। আমার কিসের দায়! সুধা সেন আমার কে! অমন কত অসংখ্য মেয়ে কলকাতার রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। আর অভাব? অভাব কার নেই! বি. এ. পাশ করেছে, প্রাইভেটে এম. এ. দেবে, তারপর হয়তো একদিন টি-বি হবে—হয়তো তখন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে কেউ দয়া করে। একটা ফ্রি-বেড যোগাড় হলেও হতে পারে। তারপর কে মনে রাখবে সুধা সেনের কথা। দেশে মা হয়তো মনিঅর্ডারের আশায় মাসের পর মাস বসে থাকবে—ভাই-এর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে টাকার অভাবে। বড়দাকে মাঝরাতে উঠে আর দরজা খুলে দিতে হবে না। ছোড়দাকে বিরক্ত করতে আসবে না কেউ।...

সুধা সেন নিজেই উঠে এসেছে।

'নেমে পড়ুন, গোয়াবাগানে এসে পড়েছি যে—'

গলির ভেতরে বাড়িটা খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হল। তা হোক, পাওয়া গেল তা-ই ভালো। একটা আধপুরোনো বাড়ির অর্ধাংশ। সেই অর্ধাংশ নিয়েই মেয়েদের বোর্ডিং।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটার প্রবেশপথের একটা নিশানা খুঁজছিলাম।

'সুধাদি!'

পেছন ফিরে দেখি একটা ছোট ছেলে সুধা সেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিরে বিলু, তুই। এখানে কোথায় ?'

ছোট হাফ্‌প্যাণ্ট পরা ছেলেটা চেনে সুধা সেনকে। আমার কাছে যেন হঠাৎ সুধা সেনের মর্যাদা বেড়ে গেল। সুধা সেনকে কেউ চিনবে, কেউ তাকে চিনে নাম ধরে ডাকবে, তা সে হোক না ছোট ছেলে—এটা যেন আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। তাহলে নিতান্ত অসহায় নয় সুধা সেন। তারও এই কলকাতা শহরে পরিচয়ের স্বর্ণসূত্র আছে। সেই সূত্র ধরে সে আশ্রয়ের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছতেও পারে।

'তোরা কবে এলি রে কলকাতায় ?'

'এই তো সাতদিন এসেছি মামার বাড়িতে। আমি কিন্তু তোমায় দেখেই চিনতে পেরেছি সুধাদি'—বিলু বললে।

'মা কেমন আছে রে ?'

তারপর আবশ্যক-অনাবশ্যক অনেক কথা। সুধা সেন যেন হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠলো। সুধা সেনের দেশের ছেলে। অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেছে। আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। এখন কোনো রকমে সুধা সেনকে ছেলেটির হাতে গছিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি। সুধা সেনের সঙ্গে পরিচয় থাকার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারি।

সুধা সেন বললে, 'তুই দাঁড়া বিলু, এখানে যদি ঘর না পাই, তাহলে তোর মামার বাড়িতেই উঠবো একটা রাত্তিরের জন্যে।'

যাক, এতক্ষণে যেন আশার একটা ক্ষীণতম সূত্র পাওয়া গেল। তারপর সুধা সেনকে নিয়ে বোর্ডিং-এর গলির ভেতর ঢুকলাম। গলির পেছন দিকে ছোট দরজা। সুধা সেনই সামনে এগিয়ে গেল।

'আপনাদের বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?'

'তিনি তো এখন নেই। কী বলবেন আমাকে বলুন।'

বেশ বর্ষীয়সী মহিলা একজন। বিধবার বেশ। সরু চুলপাড় ধুতি পরনে। মাথায় একটু ঘোমটা। আমি এগিয়ে গেলাম। বুঝিয়ে বললাম সব। বললাম সুধা সেনের সত্যিকারের সবিস্তার দুর্দশার কাহিনী।

আশ্রয় এখানে না পেলে আজ রাত্রে কোথায় কাটাতে হবে, তার কোনো ঠিকই নেই। সুধা সেনের কৃশ চেহারা দেখে মহিলাটির যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও যেন দূর হয়ে গেল। সুধা সেন বিধবা নয়—কুমারী, তবু মহিলাটির বোধ হয় মনে হল—বিধবার চেয়েও সহায়হীন সে। যে সুধা সেনের কৃশ, রুগ্ন চেহারা আমার মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করেছে, তাই-ই মহিলাটির মনে সহানুভূতির সৃষ্টি করতে পেরেছে যেন।

মহিলাটি বললেন, 'এখন তো আমাদের কোনো সীট খালি নেই, তবে কয়েকদিন পরেই খালি হবে…'

তারপর খানিক থেমে আবার বললেন, 'তবে নেহাত যদি কোথাও থাকবার জায়গা না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে দিতে পারি কয়েকদিনের জন্যে।'

একটা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। মনে হল ঘাড় থেকে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। সুধা সেনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। বিছানা সঙ্গে আনেনি সুধা সেন। তা সে কাল সকালে আনলেই চলবে। স্যুটকেসটা ছাত্রের বাড়িতে পড়ে আছে, সেটাও কাল সকালে আনলেই চলবে। ইতিমধ্যে একটা মাদুর বা ছেঁড়া শতরঞ্জি কি আজকের রাতটার জন্যে কারোর কাছে ধার পাওয়া যাবে না? বালিশ সুধা সেনের দরকার হয় না। মাথার ওপর একটা ছাদ, চারদিকে চারটে দেওয়াল, আর ছেঁড়া একটা মাদুর—এর বেশি কোনো দিন কিছু চায়নি সুধা সেন। সুধা সেনকে সেইখানে রেখে আমি আর সুধা সেনদের দেশের সেই ছেলেটি চলে এলাম। গলির বাইরে এসে একটা মুক্তির নিশ্বাস পড়লো। সারা দিনটার এমন অপব্যয় আর কখনও করিনি এর আগে। সুধা সেন আমার কাঁধ থেকে নামলো শেষ পর্যন্ত সেই-ই আমার সৌভাগ্য!

শুধু এইটুকু ঘটনা হলে এ গল্প লেখবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে যে বিপরীত চরিত্রের আর একটি মেয়েকে আর একদিন অন্য পটভূমিকায় দেখতে পাব, সে কথা কি আমিই জানতুম!

সুবোধ এসেছিল কলকাতায়। নতুন-দিল্লীর বড় কনট্রাক্টার সুবোধ রায় আবার বহুদিন পরে কলকাতায় এল।

সুধা সেনকে ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে রাখবার মতো মেয়ে তো সুধা সেন নয়। বহুদিন পরে বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'তোমাদের সুধা সেনের খবর কি বৌদি ?'

বৌদি বলেছিল, 'তোমায় তো বলেছি, সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ধানবাদে চলে গেছে, সেখানে পাঁচ টাকা মাইনে বেশি পাবে নাকি। আমরা অফিসের সব মেয়েরা অনেক করে বললাম, কিছুতেই থাকলো না। বললে,—এ মাইনেতে আর কুলোতে পারছি নে।'

সুধা সেনকে অনেক কষ্টে বাসা যোগাড় করে দিয়েছিলাম, ওইটুকুই শুধু মনে ছিল। কিন্তু পাঁচ টাকা বেশি মাইনের লোভে কলকাতার বাসা সে ত্যাগ করবে, তা আগে জানলে সেদিন অত কষ্ট স্বীকার করতাম কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমার বন্ধু সুবোধ রায়ের ও-সব সমস্যা নেই। বছরের মধ্যে বার দুই-তিন কলকাতায় আসতে হয় সুবোধ রায়কে এবং বরাবর কলকাতার নাম-করা হোটেলেই এসে ওঠে। সেখানে রুমের যত অভাবই হোক, সুবোধ রায়ের জন্যে সবচেয়ে ভালো ঘরটাই ব্যবস্থা করা হয়—তেতলার সবচেয়ে দামী দক্ষিণমুখো একটা ঘর। আলো হাওয়া প্রচুর। ঘরের দক্ষিণমুখো ব্যাল্‌কনি থেকে সামনের পার্কটা দেখা যায় ; হু হু করে হাওয়া আসে দিন-রাত। দুটো ফ্যান। বাথরুম পাশেই। বাথরুমে গরম কলের জলের ব্যবস্থা। শাওয়ার বাথ্। মোজেয়িক করা মেঝে। দুটো চাকর অনবরত অ্যাটেণ্ড করে। হোটেলের সর্বোত্তম সুখসুবিধা ওই ঘরটাতেই আছে। তার জন্যে চার্জ যা করা হয়, কনট্রাক্টার সুবোধ রায়ের পক্ষে তা কিছুই না। ও-ঘরটার বিশেষ দরের জন্যে ও-টা এমনিতে সাধারণত খালি পড়েই থাকে।

নিয়মমতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে তেতলায় চলে গেছি। ছুটির দিন দেখেই গেছি। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে হঠাৎ বাধা পেতে হল।

'কাকে চাই, সাব্ ?'—একটা চাপরাসী উঠে দাঁড়াল।

'সুবোধ রায়। দিল্লী থেকে এসেছেন।'

'তিনি দোতলার কামরায় আছেন, ওখেনে খোঁজ করুন।' চাপরাসীটা বললে।

'এখানে তবে কে আছেন ?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'মেম সাহেব।'

মেম সাহেব! যেন বিতাড়িত, অপমানিত বোধ করলুম। মনে হল—সুবোধ রায়কে তার চির-অধিকৃত ঘর থেকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে।

নিচে গিয়েই দেখা হল। বললাম, 'একি ? কী হল ? এ ঘরে ?

সুবোধ রায়ের মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম সে-ও কম বিরক্ত হয়নি।

সুবোধ বললে, 'কে একটা খুব বড়লোক মেয়ে এসেছে—ওই ঘরেই আছে।'

'বাঙালী নাকি ?' জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ, বাঙালীই তো শুনেছি। দু'হাতে পয়সা খরচ করছে। চাকর-বাকর, চাপরাসী, আয়া সকলকে বকশিশ দিয়ে এরই মধ্যে হাত করে ফেলেছে। ভালো ভালো ডিশ্ যা-কিছু সব অর্ডার দিচ্ছে। সকালে ব্রেক-ফাস্টে ডিম একদিন বাসি ছিল বলে কমপ্লেন করেছে। শুধু তাই নয়, ব্রেক-ফাস্ট লাঞ্চ ডিনার কোন কিছুতে একটুকু ত্রুটি ঘটলে নাকি অনর্থ ঘটাবে মেয়েটি। দু'চারজনের ইতিমধ্যে ফাইনও হয়ে গেছে। ম্যানেজার থেকে সুরু করে জমাদার পর্যন্ত সবাই সন্ত্রস্ত। এতটুকু ত্রুটি যাতে না ঘটে সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য। গেটে দারোয়ান একদিন সেলাম করতে ভুলে গিয়েছিল বলে শাস্তিও নাকি হয়েছে তার। এখন হোটেলের মালিকের কানে যাতে না যায় সেই চেষ্টাই করছে ম্যানেজার। নইলে যে-সব ত্রুটি এ-পর্যন্ত ঘটে গেছে তা তাঁর কানে গেলে ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত হতে পারে।'

কেউ কেউ বলছে, 'কোনো এক দেশীয় রাজ্যের ছোটরানী লুকিয়ে এসে এখানে রয়েছে।'

সুবোধ বললে, 'মেয়েটাকে দেখিনি কখনও। বিয়ে হয়েছে কি হয়নি জানিনে—তবে খায় খুব—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাই সিঁড়ি দিয়ে ওয়েটাররা ডিশের পর ডিশ্ নিয়ে যাচ্ছে। ডিনারেও তিনটে কোর্সে কুলোয় না।'

অনেকদিন আগেকার সুধা সেনকে মনে পড়লো। সুধা সেন খেত না। খাবার জায়গাও ছিল না বটে, তা ছাড়া পয়সাও ছিল না সুধা সেনের। তারপর সেই রেস্তোরাঁর কেবিনে ঢুকে গোগ্রাসে খাওয়া! সেদিন সুধা সেনের খাওয়া বড় বিশ্রী লেগেছিল মনে আছে।

দেখলাম হোটেলের চাকর-বাকররা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেশি গোলমাল না হয় কোথাও। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সিঁড়ি ধোয়ামোছা —পরিষ্কার ঝক্ঝক তক্তক্ করছে। কয়েকটা পাম, অর্কিড আর ফুল-গাছের টব দিয়ে সাজিয়েছে সারা বাড়িটা। কে এসেছে যে তার জন্যে এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন!

সুবোধ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে দু'চারদিন গিয়েছি, কিন্তু সেইদিনই প্রথম দেখা হয়ে গেল। দেখে অবাক্ হলাম। দারার কাটা মুণ্ড দেখে সাজাহানও এত বিস্মিত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ!

সুধা সেন!

পেছনে পেছনে দুটো ওয়েটার চলেছে সুধা সেনের। সিঁড়ির আশে-পাশে যারা ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে ব্যস্ত!

এক নিমেষে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছি। বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না আমার। সেই সুধা সেন! সেই কৃশ মেয়ে! উপোস করে না-খেয়ে-খেয়ে পয়সা বাঁচায়! সারা শহর খুঁজে বেড়ায় একটু আশ্রয়ের জন্যে। বড়দার বাড়িতে রাত বারোটার পর গিয়ে লুকিয়ে শুয়ে পড়ে, আর স্নান করতে যায় ছোড়দার মেসবাড়িতে। একবার মনে হল ভুল দেখছি না তো! সমস্ত যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গোলমাল হয়ে গেল।

পরদিনই বৌদির বাড়িতে গেলাম।

এ-কথা সে-কথার পর বললাম,'তোমার সেই সুধা সেনের খবর কি বৌদি?

বৌদি বললে, 'হঠাৎ সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করছো যে ?'

বললাম, 'না, এমনি আজ ট্রামে সুধা সেনের মতো একটা মেয়েকে দেখলাম কিনা, সেবার বলেছিলে তো যে ধানবাদে গেছে সুধা সেন। পশ্চিমে গিয়ে মোটা-সোটা হল ? খবর পেয়েছ কিছু ?'

বৌদি খবর দিতে পারলে না। বুঝলাম সুধা সেন কাউকেই খবর দেয়নি কিছু।

দিন সাত-আট পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই হোটেলে ঢুকছি এমন সময়ে সামনেই দেখি সুধা সেন। কিন্তু আমি এড়িয়ে যাবার আগেই সুধা সেন আমায় দেখে ফেলেছে।

আমাকে দেখে সুধা সেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। চারিদিকে চাকর-বাকর চাপরাসীর ভিড়। সবাই বকশিশ পাবার জন্যে ব্যস্ত। সুধা সেনকে দেখে মনে হল যেন সে হোটেল ছেড়ে আজ চলে যাচ্ছে। স্যুটকেস বিছানা বাক্স সব সামনে নামিয়েছে। ট্যাক্সি হাজির।

সুধা সেন সকলকে বকশিশ দিয়ে একপাশে সরে এসে চুপি চুপি বললে, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালোই হল। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা দরকার আছে।'

তারপর সুধা সেন মালপত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললে, 'আসুন।'

সুধা সেন গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো। আমিও পেছন পেছন গিয়ে উঠলাম। কে জানে কোথায় আবার যাবে সুধা সেন ! বৌদির কথাটা মনে পড়লো। সুধা সেন সত্যিই কি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছে, না, যুদ্ধের কল্যাণে কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক টাকা তার হাতে এসে পড়েছে, কে বলতে পারে !

ট্যাক্সি চলতে সুরু করতেই সুধা সেন আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমাকে আপনি বাঁচান !'

আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না কী সে চাইছে।

সুধা সেন আবার বললে, 'একটা রাতের জন্যে আমার একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দিন, আমি একেবারে নিরাশ্রয়।'

তবুও যেন কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তবে এই ঐশ্বর্য, এই বকশিশ দেওয়ার বহর, এই হোটেলের সবচেয়ে সেরা ঘর নিয়ে থাকা, এই ব্রেক-ফাস্ট লাঞ্চ ডিনার···

সুধা সেন বললে, 'আপনাকে আমি সব খুলেই বলছি, আমায় বিশ্বাস করুন। আমার কাছে আর একটা টাকাও নেই। এতদিন না-খেয়ে-খেয়ে যা কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আবার আজ নিরাশ্রয়। এই ট্যাক্সি ভাড়া করেছি বটে, কিন্তু কোথায় যাব কিছুরই ঠিক নেই।'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। আমি প্রাণশূন্য দৃষ্টি দিয়ে সুধা সেনের দিকে চেয়ে রয়েছি। আমি কি আবার সেই সুধা সেনের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে চলেছি! আবার সেই হোস্টেল, মেস আর বোর্ডিং-এর দরজায় দরজায় বে-হিসেবী সুধা সেনের জন্যে ধর্ণা দিতে চলেছি! তারপর এই ট্যাক্সি-ভাড়া, তা-ও কি আবার আমাকেই দিতে হবে!

সুধা সেন তার কাঠির মত আঙুল দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলে, 'আপনাকে একটা জায়গা খুঁজে দিতেই হবে আমার জন্যে। আপনি যে সেই বলেছিলেন আপনার কোন্ এক বন্ধু আছে—চলুন না এখন তার ওখানে—যদি থাকতে দেয়।'

সেদিন বলেছিলাম বটে। কিন্তু সুখেন্দুর বাড়ি তো এখানে নয়। বেলগাছিয়ার একেবারে শেষ প্রান্তে সে-বাড়ি। তা ছাড়া তার এক দিদির একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আসবার কথা ছিল। যদি তারা এসে থাকে, তাহলে কি আর জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে! রাগে দুঃখে ধিক্কারে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো।

সুধা সেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা চলুন, দেখি—'

ট্যাক্সি চললো। হাওয়ার মতো উড়িয়ে চললো। সুধা সেনের চুলগুলো উড়ে পড়ছে তার কালো মুখের ওপর। কে জানে কোথায় এ-যাত্রার শেষ!

শেষ পর্যন্ত আশ্রয় আজ মিলবে কিনা ঠিক কী! কলেজ স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট পেরিয়ে ডান দিকে চলল ট্যাক্সি। বেলগাছিয়ার পুল পেরিয়ে আরো ভেতরে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল এক গলির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'আপনি বসুন, আমি দেখে আসছি।'

অন্ধকার গলি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা। রাত তখন বেশি হয়নি। নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে আসতেই বাড়ির ভেতর থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের কলরোল কানে এলো। এ বাড়িতে তো ছোট ছেলেমেয়েদের বালাই ছিল না। তবে কি সুখেন্দুর দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে নাকি! ডাকবো কিনা ভাবছি। যদি সুধা সেনের উপকার হয়। কিন্তু মনটা আমার বিষিয়ে উঠলো। বে-হিসেবী সুধা সেনের পরিচয় তো আমি ভালো করেই পেয়েছি। বন্ধুকে আর ডাকলাম না। গলির এ প্রান্তে ট্যাক্সির কাছে আর ফিরেও এলাম না। এ প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়লাম আর একটা সমান্তরাল বড় রাস্তায়। তারপর কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে উঠে পড়লাম ধর্মতলার ট্রামে। তারপর চলন্ত ট্রামের জনবহুল একটি কোণে নিজেকে আড়ালে রেখে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। থাক্ সুধা সেন ট্যাক্সিতে বসে। ট্যাক্সির ভাড়া যদি না দিতে পারে, তাতে আমার কি আসে যায়! সুধা সেন প্রতীক্ষমাণ ট্যাক্সিতে বসে মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে থাক্, আমি ততক্ষণ বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিবিড় ঘুমের মধ্যে গা গড়িয়ে দেব। আমার এত কিসের ভাবনা সুধা সেনের জন্যে!

কয়েক দিন পরে বৌদিকে সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করতেই বৌদি বললে,—একদিন নাকি হঠাৎ রাত বারোটার সময় সুধা সেন ট্যাক্সি করে বৌদির বাড়িতে এসে হাজির। সে রাতটা বৌদির বাড়ির সিঁড়ির ঘরের ভিতর কাটিয়ে সকালবেলাই চলে গেছে আবার—কোথায় চলে গেছে বলে যায়নি। সুধা সেনের চাকরিও চলে গেছে অফিস থেকে।

সুধা সেন! ভাবলেই সুধা সেনের চেহারাটার কথা মনে পড়ে। সেই কৃশ স্বাস্থ্যহীন চেহারা, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, হয়তো কলকাতা শহরের জনতার

ভিড়ে মিশে গেছে আবার। নয়তো ফিরে চলে গেছে দেশে—মা'র নিশ্চিন্ত-নির্ভর আশ্রয়ের নীড়ে। শহরের অশান্ত প্রতিযোগিতার ক্লান্তি থেকে অনেক দূরে—যেখানে অবারিত মাঠ, দিগন্ত-বিসারী আকাশ, আর স্নেহকোমল ছায়া-নিবিড় নীড়। চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের আবরণে সেখানে শরীর কৃশ আর আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসে না। সুধা সেন সত্যি সত্যি আবার সেইখানেই ফিরে গেছে কিনা কে বলতে পারে!

আমার জীবনে সুধা সেন তারপর চিরকালের মত হারিয়েই গিয়েছিল মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম ও-পরিচ্ছেদের বুঝি ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ হয়েছিল।

গল্পটা সোনাদিকে বলেছিলাম। সোনাদি বললে, 'সুধা সেনকে নিয়ে উপন্যাস হবে না তোর, ও তো এক চোখে দেখা, আর একটা দিকও আছে সুধা সেনের, সেটা তুই দেখতে পাসনি—'

কিন্তু হারিয়ে সেদিন যায়নি সুধা সেন। মনে আছে তার কত বছর পরে সুধা সেন হঠাৎ একটা চিঠি দিয়েছিল। লিখেছিল, 'আসছে সতরোই ফাল্গুন আমার বিয়ে, আপনার কিন্তু আসা চাই-ই—'

চিঠিটা পড়ে কিছুকালের জন্যে আমি যেন হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। এর চেয়ে আমাকে ধরে চাবুক মারলেও যেন আমি এত স্তম্ভিত হতাম না। এমন করে আমার জীবনে আর কোনও মেয়ে আমাকে এমন অপমান করেনি, এইটুকুই শুধু আজ মনে আছে।

মনে আছে তারপরে একটা গল্প সোনাদিকে না-শুনিয়ে একেবারে লিখেই ফেলেছিলাম। আমার বাড়ির পাশের অলকা পাল। অলকা পালকে দেখতাম কেবল টিউশানি করতে আর স্কুলের চাকরি করতে। দেখে মায়া হত আমার। মনে হত অলকা পালের জীবনে কোনো দিন কোনো আগন্তুক ভুল করেও বুঝি আসতে পারে না। নেহাত সুধা সেন-

এর মতোই বুঝি সে সংসারে একেবারে নিরর্থক। কিন্তু সেই অলকা পালের বাসার সামনেও দেখেছিলাম একদিন একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর ভেতরে বসে আছে আমার দাদার বয়সী একটা ছেলে। কেমন যেন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বোধ হয় দু'দিনই দেখেছিলাম গাড়িটা। তারপর আর কোনো দিন কোনো রহস্য আমার মনে জাগেনি অলকা পালকে নিয়ে। সুধা সেন-এর জীবনে যৌবন এসেছিল কিনা কে জানে। অন্তত আমার চোখে তা কোনোদিন ধরা পড়েনি। কিন্তু অলকা পালের জীবনে হয়তো এসেছিল। এবং তা-ও বুঝি কেবল এক মুহূর্তের জন্যে! তাই-ই বা ক'জনের আসে! গল্পটা যেমন লিখেছিলাম তেমনিই বলে যাই—

রোজ রাত্রে যে শব্দটায় অলকার ঘুম ভেঙে যায়—সেই শব্দটা সেদিনও সুরু হল। অলকা বিছানা ছেড়ে উঠলো। ঘুম যদি তার আবার আসে, তবে সে তার সৌভাগ্যই বলতে হবে। এ পাড়ায় এ-বাড়িটা নতুন ভাড়া নেওয়া হয়েছে। চারপাশের অধিবাসীদের সঙ্গে এখনও ভালো করে পরিচয় হয়নি। অপরিচয়ের আবরণ ঠেলে তারা কেউ আত্মপ্রকাশ করেনি আজো। কিন্তু ছাদে উঠলে দেখা যায় পাশের বাড়ির একতলার রোয়াকে বসে বউরা সংসারের কাজে ব্যস্ত—অলকাকে দেখে তারা ঘোমটা বড় করে টেনে দেয়। স্বাধীন মেয়েদের ওরা পুরুষেরই সামিল বলে ধরে নেয় বোধ হয়।

শীতের রাত। খুব বেশি শীত নয়, তবু গায়ে চাদর ঢাকা দিতে হয়। জানলাটা খোলা ছিল। খোলা জানলার ওপাশে রাস্তার পারের চিলে-কোঠা, তার ওপর আকাশ—ফিকে নীল। কতদিন রাত জেগে অলকা নীল ভোর দেখেছে। কিন্তু শব্দটা কিসের! অলকা জানলার কাছে এল। পাশের বাড়িতে আওয়াজটা হচ্ছে মনে হল। স্টোভের আওয়াজ; এত রাত্রে স্টোভ জ্বালবে কে? কারোর অসুখ?

'অলক!'

অলকা চম্‌কে উঠেছে। নিঃশব্দে প্রীতি জেগেছে। অলকা বললে, 'ঘুম ভেঙ্গে গেল তোর?'

'কাল কখন এলি ?'

কাল রাত্রে অলকার ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল। সেই টালিগঞ্জ··· ছাড়তে কি চায়! ক্লাস ফাইভের মেয়ে—লেখাপড়ায় অত ঝোঁক কে জানে। তারপর পড়িয়ে আসার পর ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ নিয়ে যখন অলকা ফিরে এসেছিল, তখন এখানকার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানার পাশে মেঝেতে খাবার ঢাকা ছিল। শীতকালে ঠাণ্ডা ভাত খেতে অলকার কষ্টই হয় একটু। মা দেশ থেকে চিঠি লিখেছিল স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখতে। অলকা আবার হাসলে—স্বাস্থ্য দিয়ে তার কী হবে! যে-স্বাস্থ্য নিজেরই কোনো কাজে লাগলো না, তা দিয়ে কী কাজ হবে তার!

আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে। নীল ভোর। আজ কুয়াশা কম। অলকা গায়ের ওপর একটা আলোয়ান চাপিয়ে দিলে। এখনি আরম্ভ হবে দিনের কাজ। ছুটতে হবে পড়াতে। পড়িয়ে এসে স্কুলে যেতে হবে। স্কুল সেই অনেক দূরে—হাঁটতে হাঁটতে প্রাণান্ত। প্রাণান্তকর পরিশ্রম না করলে কি চলে! মা দেশ থেকে চিঠি লিখেছিল, স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে। অলকা আবার হাসলে। তার আবার স্বাস্থ্য!

প্রীতি বললে, 'কাল তোকে কে খুঁজতে এসেছিল, জানিস অলক ?'

'কে রে ?'

অলকার বিস্ময়ের আর সীমা নেই। পরিচিত আর স্বল্প পরিচিতের ভিড় ঠেলে অলকার দৃষ্টি অনেকদূর প্রসারিত হল—কে তাকে ডাকতে এসেছিল!

প্রীতি বললে, 'তোর নাম করলে আবার—'

অলকা অবাক্ হল—এ-বাড়ির ঠিকানা তো কেউ এখনো জানে না! 'কী রকম চেহারা রে ?'

'চেহারা কি আমি দেখেছি ? অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। আজ সকালে আবার আসবে বলেছে। রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল—বিরাট একটা মোটর, মোটরে সে একলা শুধু—'

অলকা বিস্ময়ে আরো অবাক্। তার কাছে কে আসবে গাড়ি চালিয়ে! জানাশোনার মধ্যে কারই বা গাড়ি আছে! আবার বিরাট গাড়ি।

চেহারাটা কেমন জানতে পারলে ভালো হত। যার গাড়ি আছে—তার চেহারা ভালো হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু—কে সে। অলকা কৌতূহলে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। আজই আসবে, আজ সকালেই, সকাল হতে আর কতই বা দেরি। তার ঠিকানাই বা জানে কে? সুব্রত চৌধুরী নয় তো; সে কেন হতে যাবে। গাড়ি সে পাবে কোথায়। মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী সে—লটারীতে টাকা পেয়ে ছাড়া গাড়ি কেনা তার পক্ষে অসাধ্য। সুব্রতর বাড়িতে পোষ্য অনেক—তাকে বিয়ে করলে অলকার অশান্তির অন্ত থাকবে না।

প্রীতি বললে, 'কে রে, অলক?'

অলকা বললে, 'নাম বললে না তোকে?'

'নাম কি জিগ্যেস করা যায়?'

পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের মতো অলকার মন গতি-মুখর হয়ে উঠলো। অনেক দিন আগে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বটে। শুধু পরিচয়। তার বেশি কিছু নয়। শেষে গন্তব্য স্থানে আসবার আগেই বাসের কণ্ডাক্টার নেমে গিয়েছিল। তখনও টিকিট কাটা হয়নি। কাকে টিকিটের পয়সা দিতে হবে, ভেবে পেলে না। মাত্র তারা দুজনই ছিল বাসের আরোহী। ছেলেটি বলেছিল, 'পয়সা দেব কাকে বলুন তো।'

অলকা বলেছিল, 'আমিও তো তাই ভাবছি—'

কিন্তু বাসের ড্রাইভার এসে পয়সা নেওয়াতে শেষে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তারপর বাস থেকে নেমে পরস্পরের পরিচয় আদান-প্রদান। অলকা ঠিকানা দিয়েছিল কিনা মনে নেই। কিংবা যদি দিয়েই থাকে তো এ-বাড়ির ঠিকানা সে জানবে কেমন করে। চেহারা দেখে মনে হয়েছিল সেদিন, অবস্থা তার ভালোই—কিন্তু ঠিকানা খোঁজ করে সে কি আসতে যাবে এখানে?

চারিদিকে সাদা আবহাওয়া। অলকা আলোয়ানটা গায়ে নিবিড় করে জড়ালে। প্রীতি এখনও ঘুমের ঝোঁকে বিছানা জড়িয়ে পড়ে আছে। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে-ও। দুজনে একসঙ্গে ভাড়া নিয়েছে এ বাড়িটা। এদের

জীবনের কোন স্তরে কোনও বসন্তের পদক্ষেপ কোনোদিন পড়েনি। রুটিনের বাঁধা-ছকে তাদের দুজনের গতি আবদ্ধ। অবসরের আমেজ এদের জীবনে অস্তমিত। তবু অলকা আবার হাসলে। দেশ থেকে তার মা চিঠি লিখেছে—স্বাস্থ্যের ওপর যেন সে নজর রাখে। স্বাস্থ্য নিয়ে সে কি করবে! তার স্বাস্থ্য নিজের উপকারেই যদি না আসে—কার উপকারে আসবে?

ঝি এখনও ওঠেনি। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। চা খেলে হত।

দূর হোক ছাই—কে আসবে কে জানে! প্রীতি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। অলকা ছাদে উঠে এল। বেশ সকাল হয়েছে। নীল ভোর নয়—এখন প্রাত্যহিক কাজকর্ম সুরু হয়েছে। পাশের বাড়ির কলতলায় বাসন-মাজার শব্দ। দূর থেকে স্টীমারের হুইশ্‌ল কানে এল। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পায়চারি করতে অলকার বেশ লাগছে। ছাদের চারপাশে বুক পর্যন্ত উঁচু প্যারাপেট,—আচ্ছা, অলকা যদি ছাদ থেকে এখন পড়ে যায়। অবশ্য পড়ে যাবে না। কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কী! ধরো সে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়া মানে তো মৃত্যু! অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পর তার জন্যে কেউ কাঁদছে, কিংবা তার মৃত্যুতে কেউ শোকাচ্ছন্ন হয়ে সত্যিকারের বিরহের কবিতা লিখলে—এ-কথা ভাবতে বেশ লাগে। সুব্রত চৌধুরীকে বিয়ে করতে অবশ্য অলকার আপত্তি, কিন্তু অলকার মৃত্যুতে সে চিরকুমার হয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে—এ কল্পনাতেও যেন আনন্দ! সুব্রতর কথা মনে পড়তেই মনে পড়লো আর একটা কথা। সুব্রত একদিন বলেছিল, 'আমার টাকা নেই, তাই প্রমাণ দিতে পারিনে তোমায় কত ভালবাসি—'

সুব্রতর কথাগুলো ভালো। কিন্তু কেন তার টাকা নেই? সুব্রতর টাকা নেই—সে কি অলকার দোষ! সারাজীবন তার দেশের সংসার প্রতিপালন করে এসেছে অলকা—এখন বেশ এমন একজন ছেলে আসে: প্রচুর অর্থ, অদম্য স্বাস্থ্য, অখণ্ড আরামের আর অপরিমিত প্রেমের প্রাচুর্যে—যার সঙ্গে সে নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে দেবে! এ-জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই—আছে কেবল কল্লোল-ফেনিল সমুদ্রস্বাদের তিক্ততা। তা বলে সেই ভেবে অলকা কাঁদতে বসবে নাকি—কাঁদাটা কিন্তু ন্যাকামি। সে কি অত

দুর্বল। নাই বা এল প্রেম, নাই বা এল শান্তি, নাই বা এল স্বাস্থ্য—রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা? কেউ যদি না আসে, একলা যেতে হবে। একলাই যেতে হবে তাকে। তা বলে সুব্রতকে বিয়ে করে জীবনটা ব্যর্থ করে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে ও-বাড়ির বউ ছাদে ওঠে। তারই মুখে শোনা: এ-বাড়িতে নাকি আগেও মেয়েদের একটা মেস ছিল। তাদের এক-একজনের এক-একরকম নাম।

বউটি বলে,—'একজন আবার নাচত ভাই, জানেন, জানলা দিয়ে কদ্দিন উঁকি মেরে দেখেছি, কিন্তু ভাই, এতটুকু দেমাক ছিল না তাদের। কতদিন রান্না তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছি, বেশ ছিল তারা···তারপর—'

বউটি খুব গল্প করতে পারে। গল্প বেশিক্ষণ জমে না। গল্প করলে কি অলকার চলে! অলকার তিন-তিনটে টিউশানি, তারপর আবার দুপুরবেলা স্কুল। দেশে মা, দু'টি নাবালক ভাই, ছোট একটা বোন। তাদের ভরণপোষণ তাকেই তো করতে হয়। মাসের প্রথম দিকে তারা টাকার আশায় পিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকে। এমনি তো দেখতে বেশ, রিক্‌শা করে স্কুলে যায়—কারোর সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কিন্তু দু'পকেটের মধ্যে যার সংসার, পেছন বলতে কিছু নেই, তার বাঁচা-মরা দুই-ই তো সমান। অলকা পায়চারি করতে করতে ভাবলে—জীবনে তার পরম বন্ধুও কেউ নেই, পরম শত্রুও কেউ নেই। অলকার ইচ্ছে হয় প্রাণভরে কাউকে ভালবাসে। কারোর জন্যে সে জীবনপাত করে। সুব্রত চৌধুরীর কথা মনে পড়লো। সুব্রত একবার চিঠিতে লিখেছিল: যেদিন আমাকেও ভুলে যাবে, সেদিন শুধু মনে রেখ আমার এই কথাটা—ভালোবাসা জীবনে এক নিদারুণ অভিশাপ! তুমি যদি সুব্রত হতে আর আমি হতেম অলকা—তা হলে বুঝতে কথাটা কত বড় সত্যি!

সুব্রত সত্যি কথা ছাড়া বলে না। অলকা ভাবলে—তত্ত্বকথা সবাই জানে, সবাই বলে, তার কোনও মূল্য নেই। অলকা তো উপবাস করতে পৃথিবীতে আসেনি। তুমি কিছু দেবে, আমি কিছু নেব—তবেই না প্রেম!

অলকা হেসে উঠলো। প্রেম কথাটা ভাবলেই হাসি আসে যেন অলকার! ভারি তো জীবন—এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কোথা দিয়ে এই কুড়িটা বছর কেটে গেল। যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তারা থাকেনি কেউ। ক্ষণ-স্থায়ী বুদ্‌বুদ সব। কিন্তু সুব্রত তাকে যে কী চোখে দেখেছে কে জানে। তার মুখের ওপর অলকা রূঢ় কথা কিছু বলে না সত্যি—কিন্তু সুব্রত তো বোকা নয়, বোঝে সব। তবু অলকাকে ভুলে যাবার ক্ষমতাও তার নেই। হাজার বার সে আঘাত পাবে, তবু আঘাত করবে না একবারও। সত্যি, সুব্রতর মেয়ে হওয়াই উচিত ছিল যেন।

একটা কথা ভেবেই অলকা হেসে উঠলো—দূর, তা কখনও হয়!

অনেকদিন আগের সেই সতীজীবনকে তার মনে পড়লো। ইউনিভার্সি-টিতে পড়তো। রোজ ক্লাসের ছুটির সময় এসে দাঁড়াতো কলেজের সামনে। বড়লোকের ছেলে—একসঙ্গে গল্প করতে করতে আসতো তার হোস্টেল পর্যন্ত। মাত্র মাস দুই-এর পরিচয়। সে-পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হবার সুযোগ হয়নি। একদিন হঠাৎ আর সে আসেনি। শুনেছিল বিলেত চলে গেছে—! কিন্তু এতদিন পরে সতীজীবন কি তার খোঁজ করতে এসেছিল! একখানা কেন, সে অবশ্য দশখানা মোটর কিনতে পারে। কিন্তু সেই যদি এসে থাকে আজ!

যেমন অনেকেই বলেছে, সতীজীবন তেমনি ধরনের কথাই বলতো তাকে। পুরাতন বাঁধা-ধরা সব কথা। বড়লোকদের মুখ থেকে যে-সব কথা শুনলে আনন্দ হয়—রোমাঞ্চ হয়। অলকা তার চেহারাটা একবার মনে করবার চেষ্টা করলে। কতদূর পর্যন্ত তারা এগিয়েছিল তাও আজ মনে নেই। সামান্য একজন কলেজের মেয়ে সে তখন, আর কলেজে-পড়া বড়লোকের ছেলে সে। সে-তো প্রায় চার-পাঁচ বছর আগেকার কথা। এতদিন পরেও তাকে মনে রেখেছে নাকি সে! দূর—তাও কখনো হয়!

'দিদিমণি!'

অলকা পেছনে ফিরলো। ফিরেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।—কেউ এসেছে নাকি!

'কেউ এসেছে ?'

'চা চড়িয়েছি, ডাকতে এলুম, হাতমুখ ধুয়ে নাও—'

তবু যা হোক কেউ আসেনি।! মঙ্গলা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল বইকি।

মঙ্গলা বললে, 'কাল একজন বাবু তোমায় খুঁজতে এসেছিল—দু'বার। আমি বললাম, রাত্তিরে তো দিদিমণি থাকে না, পড়াতে যায়—'

অলকা উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে, 'আমার নাম বললে নাকি রে ?'

মঙ্গলা বললে, 'তোমার নাম করেই তো বললে। আজ সকালেই আবার আসবেন বলে গেছেন।'

অলকার বিস্ময়ের সীমা নেই। বললে, 'কি রকম চেহারা দেখলি—ফরসা, লম্বা, আর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, না ?'

অলকার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল যেন। মঙ্গলা বললে, 'গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়—মস্ত গাড়ি, সাহেবের পোষাক পরা— কোথায় আর বসতে বলি, তাই সকালে আসতে বললাম।'

অলকা বললে, 'ভালোই করেছিস।'

ভালো করেছে কি মন্দ করেছে তা কে জানে! কিন্তু অলকার মনে হল—এ কেমন করে হয়! সতীজীবন ঠিকানা কেমন করে সংগ্রহ করলে এ-বাড়ির! পাঁচ বছর—পাঁচ বছরের দীর্ঘ ব্যবচ্ছেদে মানুষের এত কথা মনে থাকে! আশেপাশের বাড়িগুলো কলমুখর হয়ে উঠলো। পৃথিবীতে ব্যস্ততা নেমেছে।

মঙ্গলা বললে, 'তুমি এসো দিদিমণি, আমি চায়ের কেট্‌লি নামাইগে—'

হঠাৎ কী যে হল, অলকা সেই প্রাতঃসূর্যের দিকে চেয়ে—যা কখনও করেনি—লজ্জায়, আনন্দে, বিস্ময়ে, প্রত্যাশায় কাকে জানিনা উদ্দেশ করে বললে, 'শান্তি দেওয়ার কথা তোমার নয়, আনন্দ দেওয়ার কথাও তোমার নয়, তবু এই মুহূর্তের প্রশান্তিকে উপলক্ষ্য করে আমি তোমায় আমার প্রণাম জানাই।' তারপর নিজের ছেলেমানুষিতে অলকা নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে উঠলো। ভাগ্যিস কেউ দেখেনি। বাজে কথা—সব বাজে কথা! সবচেয়ে তাকে প্রথম ভাবতে হবে—কেমন করে তার আরো বেশি

টাকা রোজগার হয়। তিনটে টিউশানি থেকে তার উপায় হয় পঁয়তাল্লিশ টাকা, আর স্কুলের ষাট টাকা। একশো পাঁচকে বাড়িয়ে একদিন একশো দশ করতে হবে—দশ থেকে বিশ, বিশ থেকে ত্রিশ—ত্রিশের অঙ্ক তারপর ধীর গতিতে বাড়তে থাকে। কিন্তু সে এত ভাবে কেন। কাউকে যদি সমস্ত মনের কথা বলা যেত। সমস্ত—সমস্ত। এখন এই সকালবেলা টেলিফোনেও কাউকে সব বলা যেত যদি। বন্ধু তার কেউ নেই। এখনি প্রীতি ছুটবে টিউশানিতে। দেখা হবে যাবাব সময়। কথা বলবারও সময় নেই তার।

নিচে থেকে মঙ্গলা ডাকলে, 'দিদিমণি।'

অলকা শঙ্কিত হয়ে উঠলো, এসেছে নাকি ?

মঙ্গলা বললে, 'চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল এদিকে—'

তবু যা হোক—অলকা খানিকটা স্বস্তি পেলে। আসেনি এখনও। কিন্তু এই তো সকাল হয়েছে। এখনি যে-কোনো সময়ে হাজির হতে পারে। অলকা দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল।

ছোড়দিমণি চলে গেছে। দৈনন্দিন কার্যতালিকার ঘূর্ণাবর্তে তার মতোই প্রীতির চলাফেরা আবদ্ধ।

আজ সকালে আর অলকা পড়াতে যাবে না। কাল যে দু'বার এসে তাকে খুঁজে ফিরে গেছে—আজ তাকে আর ফিরতে না হয়। হয়তো তাতে অলকারই লাভ।

বিছানা দুটো পরিষ্কার করে অলকা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে। দেওয়ালের আলনায় শাড়ি আর সেমিজের ভিড়, সেগুলোও গোছাতে হল। অপরিষ্কার আর অপরিচ্ছন্নতার পাহাড় হয়ে ছিল। যদি এই ঘরেই তাকে আনতে হয়। অলকা নিজে হাতেই ঝাঁটা ধরলো। পালিশ-ওঠা টেবিলটার ওপর চায়ের দাগ। হঠাৎ ঘরের আর আসবাবপত্রের অপরিচ্ছন্নতা যেন অলকার চোখে নতুন করে নির্লজ্জ হয়ে উঠলো। আগে তো অমন মনে হয়নি কোনদিন। মোটরে করে যারা আসে তাদের পরিচ্ছন্নতা-বোধ সম্বন্ধে আতিশয্য থাকাই স্বাভাবিক। মা'র দেওয়া ঘিয়ের ময়লা জারটা পাশের ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে ফেলতে হল। তারপর দেওয়ালের যতগুলো

পেরেক আর দড়ি সব নিজের হাতে খুলতে হয়। আগাগোড়া ঘরখানায় পারিপাট্যের ত্রুটি কোথাও না থাকে। পাঁচ বছর পর বিলেতের শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসেছে। সতীজীবনের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে অলকা তার সৌন্দর্য-বোধ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে নিলে। অর্থাৎ সব কিছু নিয়ে এই ঘরে সতীজীবনকে তার পাশে মানায় কিনা তাই ভেবে অলকা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু সকাল তো অনেকক্ষণ হয়েছে—অনেক ক্ষণ।

একটা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে নিজেকে বসিয়ে ভাবতে বেশ লাগে। নিতান্ত নিরিবিলি ঘর—এখন বাইরের কেউ আসছে না। প্রীতি ঘণ্টা দু'য়েক পরে আসবে। বেশি ভাবতে অলকার লজ্জা হল। নিজের শাড়িটাও অলকা বদলে নিলে এক ফাঁকে।

আচ্ছা, যদি এমন হয়—এমন যদি হয়ে···কিন্তু পরমুহূর্তেই অলকার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। মোটরের আওয়াজ যেন কানে এসেছে হঠাৎ?

অলকার মনে হল যেন সুনিয়ন্ত্রিত মৃত্যু তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। এ যেন সুব্রত চৌধুরীর অলকা নয়, স্কুলের মেয়েদের অঙ্ক-দিদিমণি নয়—নিতান্ত সাধারণ-অসাধারণত্বের গণ্ডির বাইরে ত্রস্তা ভয়-সচকিতা অলকা একান্তভাবে···

আর ভাবা গেল না।

মঙ্গলা ডাকলে, 'দিদিমণি—'

মঙ্গলার ডাক শুনে অলকা নিচে নেমে এল।

'—এই যে অলকা দিদিমণি—' মঙ্গলা এগিয়ে এল।

ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন—

'আপনি ?····'

ভদ্রলোকের কণ্ঠে বিস্ময় ও লজ্জা। বললেন, 'আমি অলকা দেবীকে খুঁজছিলাম—'

অলকা বললে, 'আমার নামই অলকা—'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাপ করবেন, এটা কি বারোর সি ? আপনারা কি এ-বাড়িতে নতুন এসেছেন ?'

অলকা বললে, হ্যাঁ'—

ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে আগে যারা ছিল তাদের ঠিকানা বলতে পারেন ?'

তারপর হঠাৎ একটা ছোট নমস্কার করে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

অলকার মনে হল—মৃত্তিকা যেন সেই মুহূর্তে দ্বিধা হল, আর অলকা অকুণ্ঠিত চিত্তে তার মধ্যে প্রবেশ করলো। অলকা স্পষ্ট দেখতে পেলে তার মাইনে সত্তর থেকে আশি, আশি থেকে নব্বুই, নব্বুই থেকে একশো—তারপর একশো'র অঙ্ক ধীরগতিতে বাড়ছে .. তারপর একদিন অলকাকে আরো বড় বাড়ি ভাড়া নিতে হবে, আরো ভালো শাড়ি, আরো গয়না। মাকে আনতে হবে। এখানে এই শহরের একটা নিরিবিলি পাড়ায় আরো ঐশ্বর্যবান হয়ে দিন কাটাতে হবে। আর কিছু নয়, আর কিছু নয়, শুধু এইটুকু মাত্র। এর বেশি চাওয়া তার পক্ষে যেন অন্যায়, যেন অনধিকার-চর্চা।

একটি মুহূর্ত! কেবল একটি মুহূর্তের জন্যে অলকা পালের জীবনে যৌবন এসেও অপমানিত হয়ে ফিরে গেল সেদিন।

গল্পটা কী জানি কেন সোনাদিকে দেখাইনি। দেখাতে লজ্জা হয়েছিল বুঝি! কিংবা হয়তো তখন সোনাদির অসুখ বেড়ে উঠেছিল। সোনাদির ছিল অদ্ভুত অসুখ। খাওয়া-দাওয়া সবই ছিল স্বাভাবিক মানুষের মতো! সবই খায়, সবই করে, কিন্তু সারাদিন শুধু শুয়েই থাকে। শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়ে কিংবা জানালা দিয়ে চোখ মেলে থাকে আকাশের দিকে। কিংবা আমার সঙ্গে গল্প করে, কিংবা চিঠি লেখে। আমার এই যে বই লেখার নেশা, এর পেছনেও ছিল সোনাদির আগ্রহ! সেদিন যে-মানুষটা উৎসাহ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, ভালো-মন্দ বুঝিয়ে দিয়ে আজকের আমিকে চিনিয়ে দিয়েছিল, সে তো আমার সোনাদি। কবে একদিন একটি নিঃসঙ্গ ছেলে নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজেছিল পৃথিবীর বিচিত্র মানুষের মধ্যে

দিয়ে, সে নিজেও বুঝি তা এতদিন জানতো না। নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যেই মাঝে মাঝে গল্প লেখার চেষ্টা করতো। মুখ-চোরা সেই ছেলেটি অবাক হয়ে ভাবতো যেন সে বড় অনাবশ্যক এখানে। ভয় হত—মানুষের প্রতিযোগিতার ভিড়ে সে বুঝি হারিয়েই যাবে একদিন। কেউ তার কথা ভাববেও না, বুঝবেও না, মনেও রাখবে না। বেদনার বুঝি শেষ ছিল না তার তাই। তাই রাস্তার একপাশে সকলের ভিড় বাঁচিয়ে সে চলেছে। সকলের চোখ এড়িয়ে সে বেঁচেছে। পরীক্ষার বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার লোক চলাচলের দিকে চেয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে বার বার। মাস্টারের সহানুভূতি সে পায়নি। বাপ-মায়ের অনাদৃত অপোগণ্ড সেই সন্তান। ইস্কুলের আর পাড়ার ছেলেদের বিদ্রূপের পাত্র হয়ে দিন কাটিয়েছে সে একলা। এমনি সময় একদিন সোনাদির সঙ্গে দেখা।

সেদিন সোনাদিকে পেয়ে যেন সত্যিই বেঁচে গেলাম আমি।

কিন্তু দিদি সম্পর্ক তো পাতানো। কবে একদিন সোনাদির বংশের কেউ আমাদের দেশে বুঝি থাকতেন। সেও তিন পুরুষ আগের কথা। সোনাদির বংশের কে বুঝি একদিন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়েছিলেন গ্রাম থেকে। তারপর যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব হয়নি সেখানে। বাংলাদেশ থেকে দূরে পরিবারের শাখা-প্রশাখা বেড়েছে। আত্মীয় স্বজন সকলকে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন। সোনাদি সেই বংশের মেয়ে। তারও বিয়ে হয়েছিল একদিন জব্বলপুরে। স্বামী নিয়ে সুখে ঘর করতে পারতো সোনাদি। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি সে-কথা এখন থাক।

সোনাদিকে দেখে আমার কিন্তু আর একজনের কথা মনে পড়তো প্রায়ই। সে আমার মিষ্টিদিদি। মিষ্টিদিদিও সোনাদির মতো শুয়ে থাকতো সারাদিন। কিন্তু মিষ্টিদিদির অসুখটা ছিল একটা প্রকাণ্ড রহস্য। শুধু আমার কাছেই যে রহস্য তা নয়, সকলের কাছেই।

সেই মিষ্টিদিদির কথা এবার বলি—

মিষ্টিদিদি আমার আপন দিদিও নয়, দূরসম্পর্কের দিদিও নয়।

তবু মিষ্টিদিদি ছিল বুঝি আমার আপন দিদির চেয়েও বড়। বলতো, 'যে-কটা দিন বেঁচে আছি, তুই আমার কাছে কাছে থাক্, জানিস।'

মিষ্টিদিদি সময় পেলেই চুপচাপ শুয়ে থাকতো। পাতলা হালকা শরীর, ধবধবে রং। ফিন্‌ফিনে সিল্কের শাড়ি গায়ের ওপর থেকে খসে খসে পড়তো। ইজি-চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুতো একবার, তারপর হয়ত তখনি আবার উঠে গিয়ে বসতো বাগানের দোলনায়। তারপরেই হয়ত খেয়াল হল—তখুনি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গঙ্গার ধারে।

জামাইবাবু আমাকে দেখিয়ে বলতো, 'ওকে সঙ্গে নিয়ো, মিষ্টি—কোথাও যদি হঠাৎ টলে পড়ে যাও, তখন—'

মিষ্টিদিদিও মাঝে মাঝে বলতো, 'তোদের সবাইকে খুব কষ্ট দিচ্ছি রে আমি—'

আমি বলতাম, 'বাঃ, কষ্ট কিসের !'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোর জামাইবাবুর দেখ্ তো, কখনও কোন অসুখ হতে দেখিনি। আমার জন্যেই তো কোথাও যেতে পারে না, আমার জন্যেই তো এত চাকর-বাকর রাখা। শঙ্করকেও দূরে পাঠাতে হল তো শুধু আমার শরীরের জন্যেই।'

মিষ্টিদিদির ঝি অবশ্য থাকতো সঙ্গে। মিষ্টিদিদির সঙ্গে দিনরাত পালা করে একটা-না-একটা ঝি থাকেই। রাত্রে যদি মিষ্টিদিদির ঘুম না আসে, ওই একজন ঝি পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুম পাড়াবে। শাড়ি যদি কাঁধ থেকে হঠাৎ খসে যায় মিষ্টিদিদির, তো একজন ঝি কাপড়টা তুলে দেবে যথাস্থানে। খেয়ালের তো অন্ত নেই মিষ্টিদিদির। কখন কী খেয়াল হবে মিষ্টিদিদি নিজেও বলতে পারে না আগে থেকে। হয়ত রাত্তির দশটার সময়েই মিষ্টিদিদির তপ্‌সে মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে হতে পারে। আশ্বিন মাসের দুপুরবেলাতেই ল্যাংড়া আম খেতে ইচ্ছে হতে পারে। জামাইবাবু হয়ত তখন আফিসে যাচ্ছে, মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার বুকটা কেমন করছে, তুমি আজ যেয়ো না কোথাও।'

জামাইবাবু তখন কোটপ্যাণ্ট পরে তৈরি। নিচে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। বললে, 'আমার যে আজ একটা জরুরী কাজ ছিল।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'তা বলে কাজটাই তোমার বড় হল?'

জামাইবাবু কেমন যেন অপ্রস্তুত ব্যস্ততায় বলতো, 'আমি বরং গিয়ে ডাক্তার সান্যালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মিষ্টিদিদির পাতলা শরীর যেন কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতো। বলতো, 'আমি আর ক'দিন! আমি মরে গেলে তুমি যত খুশি কাজে বেরিয়ো না, কাজ তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না।'

সত্যিই তো তখন আমাদেরও মন হত মিষ্টিদিদি আর ক'দিনই বা বাঁচবে। কলকাতার হার্ট-স্পেশালিস্টরা কেউ রোগ ধরতে পারতো না মিষ্টিদিদির। কতবার কলকাতার বাইরে থেকে ডাক্তার এসেছে। ভিয়েনা থেকে এসেছে। আমেরিকা থেকে এসেছে। জামাইবাবু মোটা মোটা টাকা দিয়ে সব রকম চিকিৎসা করিয়েছে। কেউ রোগ ধরতে পারেনি। কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একমত হয়ে বলে গেছে, রোগীর মনে কোনো রকম উত্তেজনা হতে দেওয়া উচিত নয়। একটু উত্তেজনা হলেই আর বাঁচানো যাবে না রোগীকে।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আমি মরে গেলে তুমি যেমন খুশি যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়িয়ো, আমি দেখতেও আসবো না। কিন্তু যে দু'টো দিন বেঁচে আছি, আমাকে দয়া করে শান্তিতে বাঁচতে দাও।'

তা মিষ্টিদিদিকে শান্তিতে বাঁচতে দেবার জন্যে জামাইবাবুও কি কসুর করতো কিছু!

দু'টো দিন—

অথচ 'দু'টো দিন' 'দু'টো দিন' করে কতদিন যে বেঁচে থাকবে মিষ্টিদিদি, আমি কেবল তাই ভাবতাম। তবে অপূর্ব স্বাস্থ্য বটে জামাইবাবুর। একটা দিনের জন্য অসুখ করেনি, একদিন সর্দি হল না। চল্লিশ বছরের জামাইবাবুকে যেন পঁচিশ বছরের ছোকরা মনে হত দেখে। ভোরবেলা উঠতো। উঠে সামনের সমস্ত বাগানটা জোরে জোরে হেঁটে নিত দশ-পঁচিশ

বার। একদিনও শুনিনি যে জামাইবাবুর মাথা ধরেছে। কখনও ডাক্তারের কাছে সঁপে দিতে হয়নি নিজেকে। কবে যে ওষুধ খেয়েছে তা মনেই পড়ে না জামাইবাবুর। এমনি অটুট স্বাস্থ্য। এমনি আঁট শরীর।

কিন্তু তবু জামাইবাবুকে গঞ্জনা শুনতে হত মিষ্টিদিদির কাছে।

রবিবার। খাবার টেবিলে হয়ত সবাই খেতে বসেছি। জামাইবাবুও খাচ্ছে একমনে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'ওমা, ওই অতগুলো মাংস তুমি সত্যি সত্যি খাবে নাকি?'

কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল জামাইবাবু। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। তারপর মাংসের প্লেটটা পাশে ঠেলে দিয়ে বললে, 'তাইতো, আমাকে বড্ড বেশি মাংস দিয়েছে দেখছি, ঠাকুর।'

মিষ্টিদিদিকে আমি লক্ষ্য করেছি তখন। ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি একরাশ নিয়েছে পাতে। বার বার চেয়ে-চেয়ে ভাতও নিয়েছে এক হাঁড়ি। পোনা মাছের কালিয়ার সবটাও শেষ করে ফেলেছে! কাঁটাগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলেছে মিষ্টিদিদি। তারপর নিঃশব্দে কখন মাংসের প্লেটটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আরো মাংস দিয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। আমাদের দু'জনের ডবল খেয়ে কখন শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে বসে ডাঁটা চিবোচ্ছে মিষ্টিদিদি। জামাইবাবু লক্ষ্য না করুক, আমি তা করেছি।

তবু মিষ্টিদিদি ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বললে, 'বেশি খেয়ো না বলে দিলাম, ওতে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।'

জামাইবাবু বললে, 'কই, আমি তো বেশি খাইনি।

মিষ্টিদিদি বললে, 'এক একজনের ধারণা, একগাদা খেলেই বুঝি শরীর ভালো থাকে। ওটা ভুল।'

জামাইবাবু বললে, 'নিশ্চয়।'

এমন সময় ঠাকুর বললে, 'মা, আমড়ার চাটনি করেছিলুম দিতে ভুলে গেছি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'ভুলে গেছ ভালোই হয়েছে—ওঁকে আর দিয়ো না। আমার এই প্লেটে বরং একটুখানি দাও, কেমন রেঁধেছ চেখে দেখি।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তুই নিবি নাকি একটু ?'

বললাম, 'তা দিক্ একটুখানি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, থাক্ তোকে আর নিতে হবে না। এই বয়েস থেকে বেশি খাওয়া অভ্যেস করিস নে তোর জামাইবাবুর মতো। পেট ভরে খাবি না কখনও, এই বলে রাখলুম। একটু খালি রেখে খেতে হয়।'

তা ঠাকুর শুধু আমড়ার অম্বলই দিলে না। পুরনো ঠাকুর জানে সব! শুধু অম্বল মিষ্টিদিদি খেতে পারে না। সঙ্গে দুটি ভাত চাই। ঠাকুর ভাতও এনে দিলে মিষ্টিদিদিকে।

ঠাকুর বললে, 'আর দু'টো ভাত দেবো, মা ?'

তখন সব ভাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, পাগল হয়েছ ঠাকুর। একে দেখছ আমার শরীর খারাপ—আমাকে কি তুমি খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

কী জানি আমার কেমন জামাইবাবুকে দেখে মনে হত তার যেন পেট ভরেনি। এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে উঠে পড়তো জামাইবাবু।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'খেয়ে উঠে যেন এখনি আবার শুয়ো না গিয়ে ঘরে।'

'না না, শোব কেন, এখন আমার কত কাজ।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, খেয়ে উঠে শুলেই যত অম্বল আর চোঁয়া ঢেকুরের উৎপাত।'

জামাইবাবু তারপর নিজের ঘরে চলে যেত। আর মিষ্টিদিদির তখন নিজের স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে থাকবার পালা। বলতো, 'আমার যে কী কপাল। ইচ্ছে না হলেও মট্‌কা মেরে পড়ে থাকতে হবে বিছানায়।'

সেবার জামাইবাবুর একটা মস্ত প্রমোশন হল আপিসে। শুধু প্রমোশন নয়। সমাজে, পাড়ায়, আপিসে সর্বত্র সেটা হিংসে উদ্রেক করার মতো প্রমোশন। অর্থবান মানুষ জামাইবাবু। একসঙ্গে দু'তিনখানা

গাড়ি রাখবার মতন অবস্থা। ব্যাঙ্কের আর্থিক স্ফীতিটাও উল্লেখযোগ্য। অথচ সমস্ত নিজের চেষ্টায়। অল্প অবস্থা থেকে শুধু কর্তব্যনিষ্ঠা আর পুরুষ-কারের জোরে বাড়ি গাড়ি আর মিষ্টিদিদির মালিক হতে পেরেছে।

বিয়ের আগে মিষ্টিদিদিকে চিনতাম না। তবে শুনেছি মিষ্টিদিদির কথা।

মা বলতো, 'সে রীতিমত লড়াই বেধে গিয়েছিল মিষ্টির বিয়ের সময়ে। পটল বলে, আমি বিয়ে করবো, চাইবাসার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ বললে, আমি বিয়ে করবো—দিনরাত মনোহরদার বাড়ি দশ-বিশটা ছেলের ভিড়—টেনিস খেলা চলে ওদের, আর মিষ্টি বাগানে একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে খেলা দেখতো।'

আমি জিগ্যেস করতাম, 'মিষ্টিদিদি খেলতো না, মা ?'

'হ্যাঁ, ও আবার খেলবে কী ! ও তো কেবল ওর শরীর নিয়েই ব্যস্ত। ওর জন্যে মনোহরদা পর্যন্ত ফতুর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, কেবল ডাক্তার আর ওষুধ—কী যে রোগ কেউ বলতে পারে না, শুধু বলে বিশ্রাম নিতে হবে। ওই মেয়েকে নিয়ে মনোহরদাকে কি কম ভুগতে হয়েছে ! শেষে মনোহরদা সকলকে ডেকে বললে,—আমার মেয়েকে যে বিয়ে করবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মেয়েকে কখনও খাটাবে না, কখনও কাজ করাতে পারবে না। ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে যেমন আমি করছি। শুনে সবাই রাজী, বড় বড় লোকের ছেলে সব—বড় বড় চাকরি করে, হাজার দেড় দুই টাকা করে সব মাইনে পায়। শুনে আমরা তো চাইবাসার মেয়েরা সব হেসে বাঁচি নে। ওই তো পাতলা হাড়-জিরজিরে চেহারা, কদিন আর বাঁচবে, একটা ছেলে হলেই হাড্ডিসার হয়ে যাবে—তা কী সব আজকালকার ছেলেদের পছন্দ জানিনে মা, সবাই বলে রাজী।'

বাবা বলতেন, 'তা রোগা হওয়াই তো ভালো, খাবে কম।'

মা বলতো, 'হ্যাঁ খাবে নাকি কম, কথা শোনো, দিনরাতই যে খাচ্ছে কেবল, কী করে হজম করে মা, কে জানে ! মনোহরদা তো ওই মেয়ের জন্যেই দেউলে হয়ে গেল শেষকালে, কাঠের ব্যবসা ছিল মনোহরদার। তা মেয়ের খাওয়ার জ্বালায় দেনা হল চারিদিকে। সকাল থেকে উঠেই মেয়ের

খাওয়া ; মুখে একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। চকোলেট, বিস্কুট, লজেঞ্জ, মাংস, মাছ, শাক, খাদ্য-অখাদ্য কিছু তো আর বাদ নেই।'

বাবা বলতেন, 'তা যদি হজম করতে পারে, ক্ষতি কী ?'

মা বলতো, 'তুমি আর ঠেস্ দিয়ে কথা বোলো না বাপু, এই তো এতদিন এসেছি তোমার সংসারে, কেউ বলুক দিকিনি আমার জন্যে ক'টা পয়সা তোমার খরচ হয়েছে ডাক্তারের পেছনে ?'

বাবা হেসে উঠতেন হো হো করে। আর মা থেমে যেতো গম্ভীর হয়ে।

আমি বাধা দিয়ে বলতাম, 'মা, তারপর—তারপরে কী হল ?

মা বললে, 'তারপরই বাধলো গোল। সবাই যখন রাজী তখন মনোহরদা উপায় না দেখে বললে,—মিষ্টি যাকে বেছে নেবে তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব। তা ওদের মধ্যে পটলই ছিল সবচেয়ে মজবুত, দৌড়তে পারতো, কম বয়েস, নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছে, কুস্তিকরা চেহারা। মিষ্টির বরাবর রাগ ছিল পটলের ওপরে—'

জিগ্যেস করলাম, 'রাগ ছিল কেন, মা ?'

'তা রাগ থাকবে না ? মিষ্টি নিজে হাওয়ায় উড়ে যায়, একটু কাজ করলে মাথা ঘোরে, ঘুম না পাড়ালে ঘুম আসে না, তার চোখের সামনে অত মজবুত চেহারার মানুষকে ভালো লাগবে কেন ? তা মিষ্টি শেষ পর্যন্ত পটলকেই বিয়ে করতে রাজী হল।'

এসব ছোটবেলায় মা'র কাছে গল্প শুনেছিলাম। তারপর যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়বার কথা হল, তখন পটল-জামাইবাবুই লিখলে, 'ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে ও, কোন অসুবিধে হবে না।'

আসবার সময় মা বলে দিয়েছিল, 'বাড়িতে যেন বেশি গোলমাল কোরো না বাবা—একটি মাত্র ছেলে শঙ্কর, তাকে পর্যন্ত কাছে রাখেনি পটল, পাছে মিষ্টির শরীর খারাপ হয়—'

আমি যখন মিষ্টিদিদির বাড়িতে প্রথম এলাম, তখন শঙ্কর থাকতো দেরাদুনে। হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে বাড়ি করার পেছনেও ওই সেই একই

কারণ। এ পাড়ার অধিকাংশ অধিবাসী সাহেব-সুবো। বিরাট দশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। ঘন গাছপালা। বাড়ি থেকে রাস্তা বা পাশের বাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। কোনো রকম শব্দ আসে না এখানে। নিঝুম নির্জন আবহাওয়া। শুধু এক-একবার এক-একটা পাখির ডাক দুপুরবেলার শান্তি ভঙ্গ করে। শঙ্কর যখন জন্মাল, সেই প্রথম দিনটি থেকে তার ভার নিয়েছিল নার্স। দিনের মধ্যে এক-একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে মিষ্টি-দিদির কোলে রাখা হত। কিন্তু জামাইবাবুর হুকুম ছিল—শঙ্কর কাঁদলেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একেবারে মিষ্টিদিদির কানের এলাকার বাইরে। ভয় ছিল, ছেলের কান্না শুনলেই মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল হতে পারে। মিষ্টিদিদি যদি থাকতো দক্ষিণের ঘরে, শঙ্করকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে একেবারে সুদূর উত্তরে। হয়ত একেবারে বাগান পেরিয়ে ওদিকের মালীদের ঘরে। যেখানে ছেলে ককিয়ে কাঁদলেও মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই। সেই ছেলে ক্রমে এক-বছর বয়েসের হল। দু'বছরের হল। বড় জ্বালাতন করতে লাগলো তখন। হুড়মুড় করে দৌড়ে বেড়ায়, কান ঝালাপালা হয়ে যেত। সেই গোলমালে একদিন মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করে আর কি! ভীষণ অবস্থা। ডাক্তার এল। নার্স এল। অক্সিজেন গ্যাস এল। জামাইবাবু দু'রাত ঘুমোলো না।

অনেক কষ্টে, অনেক অর্থব্যয়ে, ডাক্তার সান্যালের অনেক চেষ্টায় সে-যাত্রা টিকে গেল মিষ্টিদদি। কিন্তু জামাইবাবু আর দায়িত্ব নিলে না। শেষকালে কী হতে কী সর্বনাশ হয়ে যাবে!

মিষ্টিদিদি সেরে ওঠার পর জামাইবাবু বললে, 'শঙ্করকে আমি দেরাদুনে পাঠিয়ে দিই, কী বলো? ওখানে ওরা ট্রেনিংটা ভালো দেয়। আর ওরা যত্নও করে খুব ছোট ছোট ছেলেপিলেদের।'

মিষ্টিদিদি ছলছল চোখে বললে, 'কী কপাল দেখো আমার, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত কাছে রাখতে পারবো না, আদর করতে পারবো না।'

'তাতে কী হয়েছে, তুমি সেরে উঠলেই—'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর সেরেছি, বেশি দিন আর নেই আমার বুঝতে

পারছি, বড় জোর দিন পনরো—তারপর আমি মরে গেলে..., ওকে কিন্তু তুমি বাড়িতে নিয়ে এসে তোমার কাছে কাছেই রেখো।'

তারপর কত পনরো দিন কেটে গেছে, পনরো বছর কাটতে চললো, কিন্তু কিছুই হয়নি মিষ্টিদিদির। প্লেট-প্লেট মাংস খেয়েছে, বাটি-বাটি আমড়ার অম্বল খেয়েছে, ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়েছে, পোনা মাছের কালিয়া খেয়েছে। দামী দামী বিস্কুট কেক্ লজেঞ্জ খেয়েছে, দামী দামী গাড়ি চড়েছে! মিষ্টিদিদির শোবার ঘর এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্ করা হয়েছে। ওষুধ, বিশ্রাম, আরাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব যুগিয়েছে জামাই-বাবু। তবু অসুখ সারেনি মিষ্টিদিদির।

অথচ কত সাবধানতা, কত সতর্কতা মিষ্টিদিদির জীবনের জন্যে। পাশের গাছের ডালে একটা কাক পর্যন্ত ডাকলে বুক ধড়ফড় করতো মিষ্টিদিদির! হাঁ-হাঁ করে তাড়িয়ে দিতে হত। ঝড়বৃষ্টির দিনে যদি জোরে মেঘ ডেকে উঠতো তো আপিস থেকে টেলিফোনে খবর নিতো জামাইবাবু—মিষ্টি কেমন আছে। খবরের কাগজটা আগে নিজে পড়ে তবে জামাইবাবু পড়তে দিতো মিষ্টিদিদিকে। অনেক খুন-জখমের খবর থাকে ওতে। সে-সব পড়ে যে-কোন মুহূর্তে হার্ট-ফেল হতে পারে। কতবার কত প্রমোশনের সুযোগ এল জামাইবাবুর। এমন সচরাচর আসে না কারোর। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে গেলে মাইনে হত পাঁচ হাজার টাকা। ওখানকার মাটির তলায় খনির সম্বন্ধে গবেষণা করতে জামাইবাবুকেই পাঠানো ঠিক করলো ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট। মাইনে ছাড়া টি-এ আছে অনেক।

কিন্তু প্রত্যেকবার মিষ্টিদিদি বলেছে, 'আর দু'টো দিন আমার জন্যে সবুর করো, আর বেশিদিন কষ্ট দেব না তোমাদের।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেছে জামাইবাবু।

'আর দু'টো দিন, শুধু দুদিন, তার পরে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে যাব—তখন তুমি যেখানে খুশি যেয়ো।'

এ-সব আজ থেকে প্রায় পনরো বিশ বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু সেই অল্প বয়সেও আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়েছে, এ ধাপ্পাবাজি ছাড়া

আর কিছু নয়। বড় স্বার্থপর মনে হয়েছে মিষ্টিদিদিকে। এই আরাম, এই বিশ্রাম, এই অর্থ-অপচয় ,এই বিলাসিতা থেকে পাছে বঞ্চিত হয়, পাছে পরিশ্রম করতে হয় মিষ্টিদিদিকে—তাই যেন এই ছলনা।

শঙ্কর যখন পুজোর আর গরমের ছুটিতে আসতো বাড়িতে, জামাইবাবু যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। বলতো, 'ওদিকে যেয়ো না শঙ্কর, তোমার মার শরীর খারাপ, জানো তো—'

শঙ্করও যেন কেমন বিব্রত হত। ও-বয়সের ছেলেদের স্বাভাবিক ধর্ম হৈ-চৈ করা, খেলা, চিৎকার করা। কিন্তু পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল শেষকালে। যেন কলকাতায় আসতে ভাল লাগত না তার। আবার স্কুলে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো। কেবল বলতো, 'কবে যে ছুটি ফুরোবে!'

মনে আছে একবার বলেছিল, 'এখানে আমার বড় মন-মরা লাগে, ভালো লাগে না মোটে।'

'কেন!'

শঙ্কর বলেছিল, 'কী জানি।'

আপন যারা, তারা এত কম বয়সে পর হয়ে যায় কেমন করে তা ভেবে আমারও আবাক্ লাগতো। আমারও মা ছিল। যখন ছুটিতে বাড়ি গেছি, সে অন্যরকম। আমাকে আদর করবার জন্যে কতরকম আয়োজন—কত রান্না, কত কী উৎসব আনন্দ হত। আর এ-ও তো মিষ্টিদিদির ছেলে। বড়লোকের ছেলে! আরো আনন্দ হওয়া উচিত বৈকি।

কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও ভুলে হো হো করে হেসে উঠতো, কোথা থেকে ঝি এসে বলতো, 'চুপ করো খোকাবাবু, মার বুক কেমন করছে।'

মায়ের ঘরের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে যদি শঙ্কর কোনদিন ঢুকে পড়তো, অম্‌নি দশজন ঝি-চাকর হাঁ হাঁ করে উঠতো, 'এদিকে না—এদিকে না—'

বাড়িটা যেন হাসপাতাল। অথচ যে রোগী সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়, খায়-দায়, সাজ-পোশাক করে। মিষ্টিদিদি বিকেলবেলা স্নান করে। স্নানের

শেষে এসে বসে আয়নার সামনে। ছু'জন ঝি আসে এগিয়ে। তখন বেরোয় রুজ, লিপস্টিক, তেল, সেণ্ট, পাউডার—আরো কত কি! ভালো ভালো পোশাকী শাড়ি বেরোয়। ব্লাউজ বেরোয়। আলতা বেরোয়। একঘণ্টা ধরে সাজিয়ে-গুজিয়ে ফিটফাট করে দেয়। তারপর ইজি-চেয়ারটা বারান্দার সামনে রেলিং-এর গা ঘেঁষে রাখা হয়। সেই সাজ, সেই পোশাক ক'রে মিষ্টিদিদি গিয়ে তখন আস্তে আস্তে বসে ইজি-চেয়ারে। কোনো কথা নেই, কোনো কাজ নেই—শুধু বসে থাকা, আলস্যের ঢেউ-এ গা এলিয়ে দেওয়া। এত আলস্য যে কী করে সহ্য করে মিষ্টিদিদি কে জানে। কিন্তু সবাই ভাবতুম—আর তো মাত্র ছু'টো দিন, হয়ত আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা,—তারপরেই তো শেষ!

ছুটির সময় দেশে গেলে মা সব শুনে বলতো, 'ও মেয়ে মনোহরদাকেও অম্‌নি করে জ্বালিয়েছে, ও পটলকেও জ্বালিয়ে ছাড়বে, দেখিস।'

কিন্তু জামাইবাবুর অদ্ভুত ধৈর্য। স্ত্রীর জন্যে হাসিমুখে এমন আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ক্ষতি স্বীকার করতে আর কাউকে দেখিনি আমি। অথচ স্ত্রৈণ বলবো কেমন করে! কোথায় যেন মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কিংবা চেহারায় একটা যাছু ছিল।

রোজই সকালবেলা জামাইবাবু একবার করে মিষ্টিদিদিকে জিগ্যেস করতো, 'আজ কী খাবে তুমি? কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

মিষ্টিদিদি কোনোদিন বলতো, 'আজকে ফাউল আনতে বলে দাও ঠাকুরকে—'

কোনোদিন বলতো, 'আজ মাটন্—'

আবার কোনোদিন বলতো, 'আজ টোস্ট আর ফাউল কাট্‌লেট করতে বলো ঠাকুরকে।'

কোনো-কোনো দিন আবার বলতো, 'চলো আজ হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি, বাড়ির রান্না আর ভালো লাগছে না।'

এমন কোনোদিন হল না যেদিন মিষ্টিদিদি বলেছে,—'আজ শরীরটা খারাপ, কিছু খাবো না।'

জামাইবাবু যদি কোনদিন বলতো, 'এত শীতে আর না-ই বা বেরোলে, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় ?'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর তো মাত্র ক'টা দিন—যে ক'দিন বাঁচি করে নিই।'

তা এসব হলো পনরো বিশ বছর আগের ঘটনা।

মিষ্টিদিদির বাড়িতে থেকে আই. এ. পাস করেছি, বি. এ. পাস করেছি —এম. এ. পাস করেছি। করে চাকরি-সূত্রে তখন বিলাসপুরে আছি। খবর পেয়েছিলাম, মিষ্টিদিদি তখন বেঁচে আছে। একদিনের জন্যেও কখনও জ্বর হতে শুনিনি, একদিনও উপোস করতে শুনিনি। আর শুনেছি মিষ্টি-দিদির জন্যে জামাইবাবু নিজের প্রমোশন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত ত্যাগ করে হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটের বাড়িতেই আছে।

কিন্তু হঠাৎ মা'র চিঠিতে সেবার জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে চম্‌কে উঠেছিলাম।

জামাইবাবুর তো কখনও অসুখ হতে দেখিনি। সে-মানুষ এমন হঠাৎ মারা গেল! জ্বর নয়, রোগশয্যায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা নয়, হঠাৎ নাকি হার্ট-ফেল করেছে।

কিন্তু ভয়ও হয়েছিল মিষ্টিদিদির জন্যে।

মিষ্টিদিদি এ-শোক কেমন করে সহ্য করবে কে জানে! জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই তো মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল করার কথা!

সমবেদনা জানিয়ে মিষ্টিদিদিকে একটা চিঠিও দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু সে-চিঠির কোনো উত্তর পাইনি বহুদিন।

সেবার যখন কলকাতায় এলাম, দেখা করলাম গিয়ে।

ঠিক সেইরকম ইজি-চেয়ারে মিষ্টিদিদি বসে। রুজ, পাউডার, লিপস্টিক, সিল্ক, সেন্ট, সাবান, ওষুধ—কোনো কিছুরই ব্যতিক্রম নেই। পাশেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ডাক্তার সান্যাল বসে ছিলেন।

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'অনেক কষ্টে তোমার মিষ্টিদিদিকে বাঁচিয়ে রেখেছি। খুব শক্ পেয়েছিলেন, তিন দিন সেন্স ছিল না একেবারে।'

বললাম, 'শঙ্কর কোথায়? শুনলাম সে নাকি কলকাতায় ফিরে এসেছে?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'এই তো বেরোল যেন কোথায়, তাকেও বারণ করেছি বেশি কাছে আসতে—এত উইক হার্ট, কোনো এক্সাইট্‌মেণ্ট সহ্য হবে না—কনস্টাণ্ট্‌ কেয়ার নিতে হচ্ছে।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'চলো একটু গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে আসি। গাড়িটা বার করতে বলো।'

ডাক্তার সান্যাল আপত্তি করলেন, 'এ অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয় আপনার—উইক হার্ট নিয়ে—'

মিষ্টিদিদি উঠলো। বললে, 'আর তো দু'টো দিন—দু'টো দিন হয়ত মোটে বাঁচবো—সারা জীবনই তো ভুগছি, এখন আর ভালো লাগে না—যা হয় হবে—'

মনে আছে, যে দু'দিন ছিলাম হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে, ডাক্তার সান্যাল দিনরাত মিষ্টিদিদির পাশে পাশে থাকতেন। কিন্তু আমার যেন কেমন ভাল লাগত না। মিষ্টিদিদির পোশাক-পরিচ্ছদেও তখন কোনো পরিবর্তন দেখিনি। শাড়ি, গয়না, সিল্ক, সেণ্ট—তা-ও পুরোমাত্রায় রয়েছে। একবার মনে হল, হয়ত স্বাস্থ্যের জন্যেই ও-সব পরেছে। হঠাৎ বৈধব্যের সাজ পরলে হয়ত জামাইবাবুর কথা বেশি করে মনে পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে শক্‌ লাগবে হার্টে। হয়ত সেইজন্যেই। হয়ত সেইজন্যেই জামাইবাবুর মস্ত অয়েল পেণ্টিংখানাও হল্‌ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সে রাত্রে মিষ্টিদিদির বাড়িতেই ছিলাম। শঙ্কর এল সন্ধ্যের পর।

আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে, 'ছোট-মামা, তুমি—'

বললাম, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'কোথাও না—'

'সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছিলি, আর এলি এখন—এতক্ষণ কী করছিলি?'

শঙ্কর যেন আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে দেখেছিলাম। বলেছিল, 'কিছু ভালো লাগছিল না, চৌরঙ্গীর ধারে মাঠে গিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে ছিলাম একলা-একলা।'

এ বয়সের ছেলের পক্ষে এমন করে সময় কাটানো কেমন যেন অস্বাভাবিক।

বললাম, 'আজকাল খেলাধুলো করিস তুই? সেই টেনিস খেলা কেমন চলছে তোর?'

'এখানে এসে পর্যন্ত ও-সব ছুঁইনি, ছোট-মামা।'

সেদিন খাবার টেবিলে ডাক্তার সান্যালও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন মনে আছে। মিষ্টিদিদির পাশেই তাঁর চেয়ার। ডাক্তার পাশে বসা দরকার। কখন মিষ্টিদিদির কি বিপদ হয়!

শঙ্কর চুপচাপ দূরে বসে খাচ্ছিল।

মিষ্টিদিদি একবার বললে, 'ঠাকুর, তোমার বুদ্ধি তো বেশ, খোকাকে অত গুচ্ছের মাংস দিয়েছ কেন শুনি?'

শঙ্কর অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'আমাকে বলছ, মা?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো বলছি। অত খাও কেন, খাওয়াটা হবে লাইট্, পেটে চাপ যেন না পড়ে—ঠাকুর না হয় ইডিয়ট্, কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ—তোমাদের স্কুলে এতসব শেখায়, হাইজিন শেখায় না?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আপনি অত উত্তেজিত হবেন না, মিসেস সেন।'

মাছের একটা মুড়ো চুষতে চুষতে মিষ্টিদিদি বললে, 'আমি আর ক'দিন ডাক্তার সান্যাল! কিন্তু ছোট ছেলেরা যদি এই বয়সেই স্বাস্থ্যের গোড়ার কথাগুলো না শেখে তো কবে শিখবে?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আমি আপনাকে বার বার তো বলেছি মিসেস সেন, এই সব সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মোটে ভাববেন না, ওতে আপনার হার্ট আরও উইক হয়ে যাবে।'

মিষ্টিদিদি ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ঠাকুর, আজকে চচ্চড়িতে ঝাল দিতে ভুলে গেছ তুমি।'

ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। বললে, 'কই, ঝাল তো দিয়েছি, মা।'

'ছাই ঝাল দিয়েছ। ডাঁটা-চচ্চড়ি ঝাল না হলে খাওয়া যায়?'

তারপর আমাকে সাক্ষী মেনে মিষ্টিদিদি বললে, 'হ্যাঁ রে, তুই-ই বল তো,—ঝাল হয়েছে চচ্চড়িতে ?'

বললাম, 'আমি তো চচ্চড়ি খাইনি।'

'কেন ? তুই চচ্চড়ি খাস না ?'

ঠাকুর বললে, 'ওটা শুধু আপনার জন্যেই করেছিলাম, মা।'

মিষ্টিদিদির গলা একটু চড়ে উঠলো, 'কেন ? শুধু আমার জন্যে কেন ? তুমি বুঝি আমাকে খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও ! আমি মরে গেলেই তোমরা সবাই বাঁচো, না ?'

ঠাকুর রীতিমতো অপ্রস্তুত। শঙ্করও দেখলাম খাওয়া বন্ধ করে মুখ নিচু করে আছে। আমিও কম অপ্রস্তুত হলুম না। আমাকে চচ্চড়ি না দেওয়াতেই তো এই কাণ্ড !

মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার যেমন কপাল—যার হার্ট দুর্বল তার যে কেন বেঁচে থাকা !'

তারপর মাংসর বাটিটা শেষ করে বললে, 'অথচ যার থাকবার কথা তিনি কেমন টপ্ করে চলে গেলেন, আর আমিই কেবল মরতে পড়ে রইলুম !'

ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আঃ আমি বার বার আপনাকে বলেছি না মিসেস সেন, ওসব কথা মোটে মনে আনবেন না, ওতে মিছিমিছি দুর্বল হার্টকে আরো দুর্বল করা—'

তারপর ঠাকুরকে বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও তো ঠাকুর, আর আমাদের কিছু দরকার নেই ! তোমরা সবাই মিলে দেখছি ওঁর রোগটাকে বাড়িয়ে দেবে কেবল।'

খানিক পরে আমার কানে কানে বললেন, 'শঙ্করকে নিয়ে তুমি চুপি চুপি টেবিল থেকে উঠে যাও তো, দেখছি তোমার মিষ্টিদিদি এক্সাইটেড হতে সুরু করেছে—যাও শিগগির—'

তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আমার। শঙ্করেরও খাওয়া শেষ হয়নি। কিন্তু মিষ্টিদিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তার পাতলা শরীরে যেন

আগুন জ্বলছে, কান দুটো ঠিক যেন করমচার মতন লাল হয়ে উঠেছে। সত্যিই বোধহয় হার্টের প্যালপিটেশন হলে ওই রকম হয়।

সেদিন নিঃশব্দে শঙ্করকে নিয়ে উঠে এসেছিলাম খাবার টেবিল থেকে, মনে আছে।

মনে আছে, পরে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'মিস্টার সেন-এর শোকটা উনি এখনও ভুলতে পারছেন না কিনা—ওইটেই দিনরাত ভোলাবার চেষ্টা করছি—দেখছ না, মিস্টার সেন-এর অয়েল পেন্টিংখানা পর্যন্ত তাই সরিয়ে ফেলেছি ঘর থেকে।'

আর একদিন বলেছিলেন, 'ওঁরা তো ছিলেন আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড-ওয়াইফ্, তাই শোকটা অত লেগেছে মিসেস সেন-এর। উনি তো মাছ-মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি দেখলুম এই স্বাস্থ্যের ওপর যদি আবার খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার চলে তাহলে তো আর বাঁচাতে পারবো না আমি। শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তবে—'

যে-ক'দিন হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে ছিলাম, সে-ক'দিন কেবল মনে পড়তো জামাইবাবুর কথা! সত্যিই তো, তাঁর তো যাবার কথা নয় এত শিগগির। কিন্তু এক-একবার মনে হত জামাইবাবু মরে গিয়ে বোধ হয় বেঁচেছেন।

শঙ্কর আর আমি এক ঘরে, এক বিছানায় শুতাম। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হত যেন পাশে উসখুস করছে শঙ্কর।

ডাকতাম, 'শঙ্কর!'

'হুঁ।'

'ঘুমোসনি এখনও?'

'ঘুম আসছে না যে, ছোট-মামা।'

'কেন ঘুম আসছে না রে, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলি বুঝি?'

'না, কোনও দিন রাত্তিরে ঘুম আসে না আমার।'

'কেন?'

'কী জানি।'

বারো বছরের শঙ্কর সেদিন তার ঘুম না-আসার কোনো কারণ বলতে পারেনি। আমিও যেন কারণটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি সেদিন।

একবার ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন মনে আছে।

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আমার আবার জন্মদিন কেন? আর ক'দিনই বা বাঁচবো!'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'আপনার জন্মদিনটা তো একটা উপলক্ষ্য, মিসেস সেন। লক্ষ্য, আপনাকে একটু আশা দেওয়া, আপনার জীবনটা যে মূল্যবান এইটে মনে করিয়ে দেওয়া। আপনি যেন এতে আপত্তি করবেন না, মিসেস সেন।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'কিন্তু আমি কি অত হৈ-চৈ গোলমাল উত্তেজনা সহ্য করতে পারবো? আমার হার্টের যা—'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'আমি তো আছি, মিসেস সেন, ভয় কি? আপনার দীর্ঘ-জীবনের কামনা নিয়েই তো এই উৎসব। সংসারের খুঁটিনাটি থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখা—এতে হার্ট বরং ভালোই হবে, আমি বলছি। আপনি কোনো 'কিন্তু' করবেন না, আপনি যেমন রোজ ইজি-চেয়ারটায় বসে থাকেন তেমনি বসে থাকবেন শুধু, আমরা পাঁচজনে আপনার দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করবো।'

তা হলও তাই। ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল মিষ্টিদিদির ঘর। বিছানা, ফার্নিচার, ড্রেসিং টেবিল—যেদিকে মিষ্টিদিদির চোখ পড়তে পারে, সবদিকে শুধু ফুল আর ফুল। শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়েছিল মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মোৎসব। মিষ্টিদিদি যেমন করে সেজে-গুজে বসে থাকতো সেদিনও তেমনি করেই বসে ছিল। সন্ধ্যেবেলা শুধু আমরা তিনজন—আমি, শঙ্কর আর ডাক্তার সান্যাল আমাদের উপহারগুলো সামনের তেপায়া টেবিলের ওপর গিয়ে রেখেছিলাম। ডাক্তার সান্যাল দিয়েছিলেন দামী হীরে সেট্-করা একটা ব্রোচ্। এখন মনে হয়, সে-জিনিসের দাম তখন ছিল খুব কম করেও আট ন'শো টাকা।

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'এত দামী জিনিস কেন দিলেন আমাকে—আমি আর ক'দিনই বা পরতে পারবো এ-সব !'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'ওইসব কথা দয়া করে আজকের দিনে আর মুখে আনবেন না, মিসেস সেন।'

আমি আর শঙ্কর দিয়েছিলাম নিউমার্কেট থেকে কেনা রজনীগন্ধার দু'টো ঝাড়।

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'ফুলই আমার পক্ষে ভালো রে—ফুলের মতোই দু'দিন শুধু আমার পরমায়ু।'

বলতে বলতে কেমন করুণ হয়ে উঠেছিল মিষ্টিদিদির চোখ। পাতলা শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল একটু। কিন্তু ডাক্তার সান্যাল ছিলেন, তাই খুব সামলে নিয়েছিলেন সেদিন।

তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্ট-এর শিশিটা মিষ্টিদিদির নাকের কাছে নিয়ে আমাদের বলেছিলেন, 'যাও শঙ্কর—তোমরা এখান থেকে শিগগির চলে যাও! মিসেস সেনের অবস্থা যা দেখছি—'

মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা সেদিন সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রতি বছর যেখানেই থাকি, মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কখনও চিঠি, কখনও টেলিগ্রাম গেছে আমার কাছে। আর প্রত্যেকবারই আমি এসেছি। কিন্তু ভুলেও কখনো ফুল উপহার দিইনি। ফুল মিষ্টিদিদির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতো না। ফুল দেখলেই নাকি তার মনে পড়তো, ফুলের মতোই তার ক্ষণস্থায়ী জীবন—ফুলের মতোই তার পরমায়ু ক্ষণিক। ও কথাটা মনে পড়া হার্ট-ডিজিজের রোগীদের পক্ষে তো মারাত্মক।

মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব প্রত্যেক বছরেই হত। শুধু মাঝখানে বছর দুই বন্ধ ছিল। সে-সময় ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নিয়ে ভিয়েনা গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে।

মিষ্টিদিদি নাকি প্রথমে রাজী হয়নি। বলেছিল, 'আর তো ক'টা দিন—তার জন্যে কেন মিছিমিছি কষ্ট করা।'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো আমি।'

আমি তখন স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি হয়ে চলেছি। কোনো খবর রাখতে পারিনি মিষ্টিদিদির। বিলাসপুর থেকে যাচ্ছি জব্বলপুরে। জব্বল-পুর থেকে নাইনিতে। নাইনি থেকে এলাহাবাদে। শুনেছিলাম হাঙ্গার-ফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে শঙ্কর থাকতো একলা। কেমন যেন মায়া হত ওর কথা ভেবে। জন্মের পর থেকে বাপমায়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ ভোগ করবার অবকাশ হয়নি জীবনে। নিঃসঙ্গ নির্ভরহীন শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে তখন সবে পা দিয়েছে শঙ্কর। মনে হত, এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিলে ভালো হয়! কিন্তু কে দেবে?

সেবারে কথাটা পেড়েছিলাম মিষ্টিদিদির কাছে।

বলেছিলাম, 'এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিয়ে দাও, মিষ্টিদিদি।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আর ক'টা দিন, তারপরেই তো আমার ইহলীলা শেষ। তখন সবাইকে ছুটি দিয়ে যাবো আমি, শঙ্করও বিয়ে-থা করে সুখে থাকতে পারবে। আর দু'টো দিন আমার জন্যে ও সবুর করতে পারবে না—'

ভিয়েনা থেকে ফিরে আসার পর যেবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে আবার নিমন্ত্রণ হল, সেবার ভেবেছিলাম স্বাস্থ্য বোধ হয় ফিরেছে মিষ্টিদিদির। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, সেই একই অবস্থা। তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে আগেকার মতো।

আমার আনা উপহারটা সামনের টেবিলে রেখে জিগ্যেস করেছিলাম, 'কেমন আছ, মিষ্টিদিদি?'

মিষ্টিদিদি তেমনি সিল্ক, সার্টিন, জর্জেট, স্নো, পাউডারে মুড়ে বসে ছিল।

বললে, 'আমার আর থাকা—আর বোধ হয় বেশিদিন নয়—!' বললাম, 'বাইরে গিয়েও সারলো না শরীর?'

মিষ্টিদিদি বললে, 'এ মরবার আগে আর সারছে না রে!'

বলে চকোলেট চুষতে লাগলো।

কিন্তু শরীর সারাবার জন্যে মিষ্টিদিদির চেষ্টারও তা বলে অন্ত ছিল না। ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে আনতেন। কখনও পুরী,

কখনও চিল্‌কা, কখনও অন্য কোথাও। ডাক্তার সান্যাল কবে একদিন চিকিৎসা করতে এসেছিলেন মিষ্টিদিদিকে। সে কোন্ যুগে। জামাইবাবু তখন বেঁচে। তারপর কতদিন কেটে গেল। রোগও সারলো না মিষ্টিদিদির, আর ডাক্তার সান্যালও গুরু দায়িত্ব থেকে বুঝি মুক্তি পেলেন না।

হঠাৎ সেবার শঙ্করের আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে দৌড়ে এসেছিলাম কলকাতায়।

এমন আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটলো, যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে।

ভয় হয়েছিল এবার আর মিষ্টিদিদিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। শঙ্করের এমন শোকে নিশ্চয়ই মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করবে। সেবার জামাইবাবুর শোক মিষ্টিদিদি যদিও বা ভুলতে পেরেছে ডাক্তার সান্যালের চেষ্টায়, শঙ্করের অপমৃত্যুর আঘাত নিশ্চয়ই অসহ্য হয়ে উঠবে! হয়ত গিয়ে দেখবো শঙ্কর তো নেই-ই, মিষ্টিদিদিও বেঁচে নেই আর।

অত্যন্ত ভয়ে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। শঙ্করের এমন পরিণতি হবে ভাবতেই পারিনি। একবার ভেবেছিলাম শঙ্কর হয়ত মিষ্টিদিদিকে আঘাত দেবার জন্যেই এই পথ বেছে নিয়েছে। হয়ত শঙ্কর ভেবেছিল, এই ভাবেই একমাত্র মিষ্টিদিদির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

কিন্তু শঙ্কর তো জানতো না মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট।

ভেতরে ঢোকবার রাস্তাতেই বাইরের ঘরে ডাক্তার সান্যাল বসেছিলেন।

বললেন, 'এসেছ তুমি—শুনেছ বোধ হয় খবরটা—?'

বললাম, 'শঙ্কর কেন এমন করলো? কী হয়েছিল?'

ডাক্তার সান্যাল সে-বৃত্তান্ত বললেন। বরাবর নির্বাক নির্বিরোধ শঙ্কর, মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি। মনে আছে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'যদি সুইসাইড না করতো শঙ্কর তো নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত শেষকালে—দেখতে—'

বললাম, 'মাথা-খারাপই বা হল কেন?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'ডাক্তারী শাস্ত্রে একে বলে 'মেনিয়া'। বেশি

ব্রুডিং নেচারের লোক হলে এ-রকম হয়। হয় সুইসাইড করে, নয়তো পাগল হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।'

তারপর বললেন, 'তোমার মিষ্টিদিদিকে যেন এ খবরটা বোলো না আবার। ওঁকে জানানো হয়নি এখনও।'

'মিষ্টিদিদি জানে না?'

'না, জানানো হয়নি, জানালে এ-যাত্রা আর বাঁচাতে পারতুম না। মিস্টার সেন-এর বেলায় জানি কিনা—হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো, ছেলের মৃত্যু কোনো মা-ই সহ্য করতে পারে না, তার ওপর মিসেস সেন-এর হার্ট-এর অবস্থা এখন আরও খারাপ, যে-কোনো দিন যে-কোনো বিপদ ঘটতে পারে।'

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে মিষ্টিদিদির ঘরে ওঠবার সময় মনে আছে আমার যেন খুন চেপে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল, শঙ্করের অপমৃত্যুর খবরটা আমিই শোনাবো মিষ্টি-দিদিকে। দেখি পরখ করে মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল হয় কিনা! যদি হয়, তাতেও আমার দুঃখ নেই। মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদির নাম কে রেখেছিল জানি না, কিন্তু মিষ্টিদিদির কোনখানটাই যেন আর মিষ্টি নয়।

কিন্তু সমস্ত সঙ্কল্প আমার মিষ্টিদিদির সামনে গিয়ে ভেসে গেল।

সেই সিল্ক, সেণ্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডার! সেই ইজি-চেয়ার, সেই শরীর-খারাপের অভিযোগ। সেই চকোলেট চোষা। সেই ঝি-এর বসে বসে পায়ে হাত বুলোনো।

সত্যিই, কিছু বলতে পারলাম না সামনে গিয়ে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'আর ক'টা দিন, তারপর তোদের সবাইকে মুক্তি দেব।' বলে চকোলেট চুষতে লাগলো মিষ্টিদিদি।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট থেকে তার পরদিন দেশে গিয়েছিলাম। মা বললে, 'শঙ্কর আমাদের সোনার টুকরো ছেলে তাই অপঘাতী হল, নইলে অন্য ছেলে হলে মাকেই খুন করতো। মনোহরদা বেঁচে থাকলে ও-মেয়েকে গুলি করে মারতো, দেখতিস।'

বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কেন ?'

'তা না তো কি, কোথায় ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবে, তা নয়, বিধবা মাগী বিয়ে করে বসলো। শঙ্কর কি সাধ করে অপঘাতী হয়েছে ভাবিস !'

বললাম, 'কে বিয়ে করেছে ?'

'ওই মিষ্টি, ডাক্তারকে বিয়ে করে বসলো অত বড় ছেলে থাকতে !'

তা এসব ঘটনাও প্রায় পনরো বিশ পঁচিশ বছর আগেকার। তারপর প্রতি বছরেই মিষ্টিদিদির জন্মদিনটিতে কলকাতায় গেছি। উপহার দিয়ে এসেছি যথারীতি ! ডাক্তার সান্যাল প্রতিবারের মতো মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যের জন্যে সতর্কতা নিয়েছেন—কোনো উত্তেজনা না হয় কোনো অশান্তি না হয় মনে ! তাহলেই মিষ্টিদিদিকে আর বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার সান্যাল বার বার বলেছেন, মিষ্টিদিদির হার্টের যা অবস্থা তাতে যে-কোনো দিন যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ! কিন্তু গত পনরো বিশ পঁচিশ বছরে কত কোটি কোটি মুহূর্ত নিঃশব্দে মহাকালে গিয়ে লয় হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তারপর যেবার ডাক্তার সান্যালেরও মৃত্যু-সংবাদ পেলাম, সেবারও ভালো করে জানতাম কিছুই ঘটবে না মিষ্টিদিদির। বেশ জানতাম, মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট। ভালো করে জানতাম, মিষ্টিদিদি আর যা-ই হোক—মিষ্টি নয় মোটেই। তবু গেছি মিষ্টিদিদির বাড়ীতে। মিষ্টি-দিদির জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আমি এড়াতে পারিনি কখনও।

এই গত বছরেও আবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কলকাতায় এসেছিলাম।

ভালো করেই জানতাম—মিষ্টিদিদি তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। পায়ে সুড়সুড়ি দেবে ঝি। সিল্ক, সেণ্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডারে মুড়ে সেজেগুজে চুপ করে থাকবে। তেমনি প্রতিবারের মতোই উপহার দেব গিয়ে। রাখবো গিয়ে তেপায়া টেবিলের ওপর। বলবো, 'কেমন আছো মিষ্টিদিদি।'

মিষ্টিদিদি তেমনি করেই বলবে, 'আমার আর থাকা, আর তো দু'টো দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো রে।'

বলে মিষ্টিদিদি তেমনি করেই ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে চকোলেট চুষবে আর আরামে গা এলিয়ে দেবে প্রতিবারের মতো। সত্যি, সৃষ্টিকর্তা যেন মিষ্টিদিদিকে অক্ষয় পরমায়ু দিয়ে পাঠিয়েছিল এ সংসারে।

কিন্তু গতবারের জন্মদিনে মিষ্টিদিদি সত্যি সত্যিই আমায় অবাক্ করে দিয়েছিল।

হাঙ্গারফোর্ড স্টীটের বাড়িতে গিয়েও প্রথমে টের পাইনি।

তেমনি চাকর-বাকর-ঝি-মালী সবই ছিল। কিন্তু সেই পরিচিত ইজি-চেয়ারটা খালি।

একজন ঝিকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'মিষ্টিদিদি কোথায় ?'

ঝি বললে, 'ঘরে শুয়ে আছেন—অসুখ করেছে।'

জিগ্যেস করলাম, 'অসুখ কবে হল ?'

ঝি বললে, 'কাল থেকে। হঠাৎ পড়ে গেছেন কাল।'

তা সত্যি অসুখ হয়েছিল মিষ্টিদিদির। ঘরে গিয়ে দেখি চিত হয়ে শুয়ে আছে খাটের ওপর। সমস্ত দেহটা অসাড়। অনড়। ধরে পাশ ফেরাতে হয়। মুখ তুলে খাইয়ে দিতে হয়। সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। প্যারালিসিসে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে মিষ্টিদিদিকে। তবু তারই মধ্যে কেউ বুঝি পাউডার, স্নো, রুজ, লিপষ্টিক মাখিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছে। পায়ে কোনো সাড় নেই। তবু একজন ঝি পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে নিচেয় বসে বসে।

বরাবরের অভ্যেস মতো বলেছিলাম, 'কেমন আছ মিষ্টিদিদি ?'

মিষ্টিদিদি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল, কিছু কথা বলতে পারেনি। শুধু ঠোঁট দুটো যেন ঈষৎ নড়তে লাগলো। মনে হল যেন বলতে চাইছে,—আমার আর থাকা-থাকি···আমার আর ক'টা দিন···ক'টা দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো...এবার সত্যি আর বেশিদিন নয় ..

মিষ্টিদিদির চোখ দিয়ে জল পড়ে পাউডার-স্নো ধুয়ে গেল। মিষ্টিদিদির চোখে সেই প্রথম জল দেখলাম জীবনে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদি যেন এখনও মিথ্যে কথা বলছে, ধাপ্পা দিচ্ছে আমাদের—এ-ও

যেন ভান, এ-ও যেন মিষ্টিদিদির নতুন একরকমের ছল। একেবারে না মরলে আর মিষ্টিদিদিকে যেন বিশ্বাস নেই।

আজ ভাবি কোথায় গেল সেই মিষ্টিদিদি। আর কোথায় গেল সেই সোনাদি।

লিখতে লিখতে আজকাল অনেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। অনেক সময় তলিয়ে যাই নিজের ভাবনার সমুদ্রে। একদিন লেখক হতে পারবো এ-কথা কি সেদিন ভাবতে পারতাম! লোলুপ নয়নে চেয়ে দেখেছি শুধু পরের বই-এর দিকে। ছাপা হয়েছে কত লোকের গল্প কত মাসিক-সাপ্তাহিকের পাতায়। কত লেখা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছে। আর ক্ষোভ হয়েছে, ঈর্ষা হয়েছে মনে মনে কবে আমি এমন লেখা লিখতে পারবো। আমার লেখা পড়ে কবে এমনি করে অন্য পাঠকরা কাঁদবে, হাসবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাবে। কিন্তু কোথায় গেল সে-সব লেখা আর সে-সব লেখক। নিজে ভুলঠিকানার চিঠির মতন শুধু এক দেশ থেকে আর-এক দেশে ঘুরেছি। এক ঘাট থেকে জীবনের আর এক ঘাটে। দশটা স্কুল ছুঁয়ে তবে স্কুলজীবনের শেষ পরীক্ষাটাই উৎরোতে পেরেছি। তখনো কি জানি শুধু স্কুলের পরীক্ষাটা শেষ পরীক্ষা নয়। জীবনের শেষ-পরীক্ষার চৌকাঠ পার হতে অক্লান্ত সাধনা চাই। কিন্তু সোনাদি না জানালে সে-কথা কি আমিই জানতাম কোনো দিন। তখনো শুধু জানি সম্পাদকের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলেই লেখা ছাপানো যায়। প্রকাশকের আত্মীয় হলেই বই ছাপা হয়। অর্থবান হলেই পরমার্থ লাভ হয়। কিন্তু সোনাদি আমায় শেখালে জীবনের আর একটা দিকের কথা। সোনাদি-ই আমাকে প্রথম স্বীকার করলো বলা যায়।

অথচ সোনাদির সঙ্গে পরিচয় সে-ও এক আকস্মিক ব্যাপার বৈকি।

অমরেশ-ই তো আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলে। সেই অমরেশ! অমরেশের গল্প বলার ক্ষেত্র এ নয়। 'কন্যাপক্ষ'তে শুধু নারী-চরিত্রের দিকটাই বলবো ভেবেছি। কিন্তু অমরেশের কথা যেদিন লিখবো সেদিন

আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে। অমরেশ নিজেও কোনদিন জানতে পারেনি আমার কী পরম উপকারটা সে করেছে।

অমরেশই একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'সোনাদি জানো, এ কবি—'

সোনাদিও ঠাট্টা হিসেবে ধরেছিল প্রথমে। বলেছিল, 'পদ্য লিখিস বুঝি তুই ?'

বললাম, 'পদ্য নয়, গল্প।'

'গল্প ?' শুনে সোনাদি কিন্তু হাসেনি ! অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। আর কিছু বলেনি।

কোথায় গেল সেই অমরেশ। কোথায় গেল অমরেশের ক্লাবের অন্য সব বন্ধুরা। সোনাদির বাড়ির সামনে বাগানের এককোণে ছিল অমরেশের আখড়া। আমরা ছিলাম অমরেশের সাকরেদ। ডাম্বেল ভাঁজতুম, মুগুর ঘোরাতুম। তারপর যথানিয়মে যখন ক্লাব ভেঙে গেল, সবাই ছিট্‌কে গেল যে যার দিকে, আমিই শুধু রয়ে গেলাম টিঁকে। সোনাদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েই গেল বরাবর।

সত্যি যদি কোনদিন আমার লেখক-জীবনের জন্মকথা লিখি তো সেদিন সোনাদির কথা আগে লিখতে হবে। সোনাদি না হলে আমার লেখক-জীবনের অনেকখানিই যে বাদ পড়ে যেত। মফস্বলের একটা গরীব ছেলেকে সোনাদি যে কী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল কে জানে। অথচ সোনাদি আসলে আমার কে। কেউ না। আমার সমসাময়িক যারা তাদের এক-একখানা করে চোখের ওপর দশ-বারোখানা বই বেরিয়ে গেল। নাম-ধাম হল তাদের। আমার একখানাও বই নেই।

সোনাদি বলতো, 'তা না থাক্, আগে হাতটা ভালো করে পাকুক—তারপর...'

এক-একটা গল্প লিখে নিয়ে পড়িয়ে শোনাতে যেতুম সোনাদিকে। বলতাম, 'এবার হাত পেকেছে ?'

সোনাদি বলতো, 'না, এখনও ঢের দেরি—জাত-উপন্যাস লিখতে এখনো অনেক দেরি হবে তোর।'

মনে আছে সেইসব দুপুরগুলোর কথা। চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সমস্ত কলকাতা খালি। রাস্তায় একটা ফেরিওয়ালাও নেই। একলা-একলা একটা সাইকেল নিয়ে চলেছি পত্রিকার অফিসে। গল্পটা কি তাদের পছন্দ হয়েছে! এ-পত্রিকার অফিস থেকে সে-অফিস! তারপর আর একটা অফিস। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। অশান্ত একটি ছেলে সারা কলকাতা সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা লেখা ছাপা হোক, দশজনে ভালো বলুক। আমার খ্যাতি হোক। আমার খ্যাতিতে আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক। এইটুকু শুধু। আর কিছু কামনা নয়।

সে-সব দুপুরে সোনাদি ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর বসে ইজি-চেয়ারে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে। হাতের বই-এর পাতাগুলো পাখার বাতাসে ফর্ ফর্ করে উড়ছে। আর বাইরের বাগানে আমগাছটার ডালে একটা কাদের ঘুড়ি এসে আটকে গেছে! বাগানের সবুজ পরিবেশে লাল-নীল রঙের ঘুড়িটা যেন একটা বেখাপ্পা ছন্দপতনের মতন আটকে আছে। সোনাদির পাড়াটার জাতই আলাদা। সকাল-বিকেলেও নিরিবিলি। হাতে বাজারের থলি নিয়ে পথচারীর আনাগোনা বড় নেই। যা-কিছু শব্দ তা মোটরের। ওটা বিশেষ করে মোটর-বিহারীদেরই পাড়া। আর আমি? আমি ওই আমগাছটার দোদুল্যমান ঘুড়িটার মতোই ও-বাড়িতে একমাত্র অতিথি। ক্ষণে অ-ক্ষণে ওখানে আমার গতি অবারিত।

শব্দ পেয়ে সোনাদি জিগ্যেস করেছে, 'কে রে—'

'আমি—'

'ও, আয়—' বলে সোনাদি আবার ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়েছে।

আবার ফিরে বলেছে, 'আর কী লিখলি—'

সোনাদি জানতো লেখার কথা বলতে পেলে আমি আর কিছুই চাই না। লেখাই তখন আমার জপ তপ নিদিধ্যাসন। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাগজ বেরিয়ে আসে তখুনি। পাঁচ-সাতটা গল্প আমার পকেটে আছেই। একটা বসবার জায়গা, একজন মনোযোগী শ্রোতা পেলেই আমি খুশি। আমি জীবন দেখবো। জীবন দেখাবো। যে-কথা লাজুক মুখচোরা মন

কাউকে বলতে পারে না, যে-কথা একা-ঘরের চার-দেওয়ালের মধ্যে মাথা কোটে—আড্ডায়, সমাজে, সভায় বেরোতে আড়ষ্ট হয়ে যায়, সেইসব কথা সস্তা তিনটাকা দামের ব্ল্যাকবার্ড ফাউন্টেন পেনের ডগায় কেমন অবলীলায় বেরিয়ে আসে। বলতে চায়,—আমি লাজুক হলেও সব বুঝি। আমাকে যতটা বোকা ভাবো আমি তা নই। আমি তোমাদেরও চিনি। যারা নিজেদের চেনো না, তাদের আমি চিনিয়ে দেব। যারা বোবা, তাদের আমি কথা ফোটাবো। আমি শিল্পী। আমি সাহিত্যিক।

সোনাদি-ই আমাকে একমাত্র ভালো করে বুঝতে পারতো।

বললাম, 'ওরা ও-গল্পটা ছাপবে বলেছে, সোনাদি—'

সোনাদি অবাক্ হয়ে যেত। বলতো, 'ছাপবে ?'

'বা রে, কেন ছাপবে না, ওদের কাগজে যে-সব লেখা বেরোয় তার থেকে তো ভালো গল্প হয়েছে—'

'তা হোকগে ভালো, সেই তারাই কি তোর আদর্শ! একদিন তোকে মহাভারত লিখতে হবে না ? একদিন পৃথিবীর মানুষ আর পৃথিবীর জীবন নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না ? কে কী ছাপলো কী ছাপলো না, কার চেয়ে ভালো হল, এ-কথা তুই ভাববি নাকি ?'

বললাম, 'আমি থাকি সেই কোথায়, গিয়ে খোঁজ-খবর না নিলে ওরা যে ফেলে রাখবে—জানা-শোনা লোকদের লেখাই ছাপবে আগে—'

সোনাদি বলবে, 'একদিন তোর কাছে সবাই ছুটে আসবে এমনি লেখা লিখতে চেষ্টা কর দিকিনি—যা কিছু দেখেছিস, দেখছিস, সব লিখে রাখ ; যা কিছু ভাবছিস, পড়ছিস, সব টুকে রাখ—সেদিন কাজে লাগবে।'

তারপর হাতের বইটাকে পাশের টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে বসতো।

বলতো, 'মানুষকে আগে ভালো করে চিনতে শেখ, ক'টা মানুষকে দেখেছিস তুই, আর বয়েসই বা তোর কত—যাদের সঙ্গে পাশাপাশি কাটিয়েছিস, একসঙ্গে দিনরাত একঘরে কাটাস, তাদেরই কি ভালো করে চিনিস বলে গর্ব করতে পারিস—এই যে এতদিন আমার সঙ্গে আলাপ

তোর, কতদিন দুপুরবেলা আমার কাছে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিস—আমাকেই কি চিনতে পেরেছিস তুই ?'

হঠাৎ আমাকে ভাবিয়ে তুলতো সোনাদি। সোনাদিকে কি চিনি ! সোনাদির সবটুকুকে ! যে-মানুষটা এই দুপুরবেলা চুল এলো করে দিয়ে ইজি-চেয়ারে বসে আছে। যে-মানুষটা ধৈর্য ধরে আমার লেখাগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনে। উৎসাহ দেয়, নিরুৎসাহ করে। কাছে টেনে নেয়, দূরে সরাতে দ্বিধা করে না। যে-মানুষটা বাইরে এত স্থির, ভেতরে এত অশান্ত। যে-মানুষটা বুদ্ধি, বিদ্যে, ফ্যাশন, সমস্ত নিঃশেষ করে দিয়েছে একটা জীবনে। যে সংসার করে, এ গৃহের গৃহিণী, অথচ এ-বাড়ীর কারো স্ত্রী নয় ! যে-মানুষ একদিন নিজের সংসার, স্বামী পরিত্যাগ করে এসেছে এক সামান্য কারণে ! যে মানুষটা এতগুলো সন্তান মানুষ করেছে, অথচ আইন মাফিক মা নয় এদের। যে-মানুষ পার্টি দেয়, সে-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হবার গৌরবে যে-কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক গৌরবান্বিত বোধ করে !

দাশসাহেব বলতেন, 'আমাকে বলা মিথ্যে, ওসব সোনা-ই জানে—'

অভিলাষ ছিল দাশসাহেবের চাকর। চা নিয়ে এলে বলতেন, 'এই তো চা খেলাম, আবার কেন—'

অভিলাষ বলতো, 'চা তো আপনি খাননি আজ—'

চটে উঠতেন দাশসাহেব, 'আলবত খেয়েছি। জিগ্যেস কর তোর মাকে—'

সোনাদি এসে বলতো, 'কী হল আবার—'

'দেখো তো সোনা, অভিলাষ বার বার আমাকে চা খাইয়ে মারতে চায়—ব্লাডপ্রেসারটা কত করে কমাবার চেষ্টা করছি—'

ছুটিতে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে এসে কোনদিন বায়না ধরলে বলতেন, 'আমাকে না—ওসব তোমরা মা-কে বলো গিয়ে।'

অফিসে গিয়ে দুপুরবেলা টেলিফোন করতেন, 'আজকে কী খাবো সোনা—'

সোনাদি একদিক থেকে বলতো, 'কেন রোজ যা খাও, টোম্যাটোর সুপ আর দু'শ্লাইস ব্রেড—'

'না, আজকে চিকেন-রোস্ট করেছিল এখানে, খাবো একটু—'

'না, ডাক্তারকে প্রেসারটা দেখিয়ে, তারপর খেয়ো যত পারো।'

জব্বলপুর থেকে স্বামীনাথবাবু লিখতেন, 'তুমি কিছু ভেবো না, পুঁটুর জ্বর ছেড়েছে। কালকে নিরানব্বুই ছিল, আজ আটানব্বুইতে নেমেছে। ডাক্তার ভাদুড়ি বলছেন,—টাইফয়েড রোগ সেরে ওঠার পর কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া ভালো। ভাবছি অফিসে ছুটি নিয়ে কিছুদিন কোথাও ওকে নিয়ে যাবো—একেবারে রোগা হয়ে গেছে, তুমি দেখলে আর চিনতে পারবে না—'

খাবার টেবিলে সোনাদি একঘণ্টা ধরে বসে বসে খেতো। তখন সবাই বাড়ির বাইরে। দাশসাহেব মাঝে মাঝে অফিস থেকে টেলিফোন করতেন। আর আমি তখন আমার গল্প-লেখার খাতা নিয়ে পড়িয়ে শোনাচ্ছি। একটা গল্প শেষ হলে আর একটা। এ একদিন নয়। সোনাদির সঙ্গে আলাপ হওয়ার প্রথম দিন থেকে কেমন যেন ভালো লাগতো। যখন কলকাতায় কেউ আমাকে চিনতো না, তখন একমাত্র সোনাদির কাছ থেকে কী সাহায্যই না পেয়েছি। তবু সত্যিই কি সোনাদিকে চিনতে পেরেছি। কিম্বা চিনতে চেষ্টা করেছি। শুধু জানতাম, সোনাদি দাশ-সাহেবের বিয়ে-করা স্ত্রী নয়। সে-কথা দুজনকে দেখে কিন্তু বোঝা যেত না। তিনটি মেয়েকে দেখেও বোঝা যেত না। সোনাদির আচার ব্যবহারে সমাজে-সভায় মেলামেশাতেও কেউ ধরতে পারতো না। বাড়ির চাকর-ঠাকুরের ব্যবহারেও সেজন্যে কিছু তারতম্য ছিল না। তেমনি সহজ স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্ক, যেমন আমার নিজের বাড়িতে দেখেছি। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর। পায়েও আলতা। সাহেবী খানা ছিল বটে, কিন্তু সোনাদির জন্যে কুলের অম্বল কিম্বা ডাঁটা-চচ্চড়ি রান্না হত মাঝে মাঝে।

আর ওদিকে স্বামীনাথবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন সোনাদিকে। আমার কাছে সোনাদির কিছুই গোপন ছিল না। সে-সব চিঠি বাইরেই পড়ে থাকতো। কোনোটাতে লিখতেন, 'একজন লাইফ-ইনসিওরের এজেন্ট এসেছিল—আর কি লাইফ-ইনসিওর করবো?'

সোনাদি লিখতো, 'লাইফ-ইনসিওর না করে বরং বাড়িটা সারাও, কিম্বা কলকাতায় একটা বাড়ি করো। চাকরি থেকে রিটায়ার করে তখন কী করবে—'

তিনি লিখতেন, 'তোমার কথামতো দুধ খাওয়া সুরু করেছি এবার।'

সোনাদি লিখতো, 'আসছে মাস থেকে দুধ খাওয়া আরো বাড়াবে—আধসের নিজের জন্যে রাখবে।'

এমনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

যখন সোনাদির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল তখন এ-সব কৌতূহল ছিল না। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও যে এক-বাড়িতে এক ঘরে বাস করতে হয়, এ-সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা ছিল না। একবারও মনে হয়নি সোনাদির স্বামী কেন জব্বলপুরে থাকেন। তিনিও কেন একবার আসেন না এখানে। কিম্বা সোনাদিই বা একবার জব্বলপুরে যায় না কেন? স্বামীনাথবাবুই যদি সোনাদির স্বামী তো দাশসাহেব কে? দাশসাহেব এ-বাড়ির কে? সোনাদির সঙ্গে দাশসাহেবের সম্পর্কটা কিসের? বেশিদিন যাতায়াত করতে করতে, বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ-সব সম্বন্ধে যখন কৌতূহল হবার কথা তখন সোনাদির ব্যবহারে এত মুগ্ধ হয়ে গেছি যে, ও সব কথা আর ভাববার অবসর পাইনি। সোনাদি যে কাকে বেশি ভালোবাসতো ধরা শক্ত। একবার মনে হত তার নিজের স্বামীকে, আর একবার মনে হত দাশসাহেবকে। আবার কখনও মনে হত—আমাকে!

সেই স্বামীনাথবাবুর সেবার হঠাৎ অসুখের খবর এল। এখন যায়, তখন যায়। সোনাদির কাছে গিয়ে বসে থাকি। ওদিক থেকে টেলিগ্রাম আসে আর এদিক থেকে টেলিগ্রাম যায়। আমি চুপচাপ শুধু বসে থাকার বেশি আর কী করতে পারি!

স্বামীনাথবাবু চাকরি করতেন জব্বলপুরে। জব্বলপুরের পোস্টাপিসের ছাপমারা চিঠি এলেই আমি জব্বলপুরের কথা ভাবতে বসে যেতুম। জব্বলপুরেও কতদিন ছোটবেলায় কাটিয়েছি। জব্বলপুরের কালোজাম-দিদির কথা, মিছরি বৌদির কথা মনে পড়তো আমার। মনে পড়তো

নেপিয়ার টাউনে কালোজামদিদির বাড়িতে আমাদের সেই ফুটবল খেলার কথা! সেই 'মনোহর-দি-মাকালফলে'র কথা! সব মনে পড়ে যেন। সেই মনোহরের সঙ্গে সেদিন এতদিন পরে হঠাৎ দেখাও হয়ে গিয়েছিল।

সোনাদির কথা পরে বলবো। তার আগে জব্বলপুরের গল্পটা বলে নিই। জব্বলপুরের মনোহর। মনোহর মানেই আমাদের নেপিয়ার টাউনের কালোজামদিদি।

প্রথম প্রথম কলকাতায় এসে সোনাদিকে দেখে আমার কেবল কালোজামদিদিকেই মনে পড়তো। মনে হত কালোজামদিদি আর সোনাদির সঙ্গে যেন কোনও তফাত নেই। যেন তুইজনেই একরকম। কিন্তু আরো ভালো করে চেনবার পর বুঝলাম, আমারই ভুল। সোনাদিকে বাইরে থেকে যা মনে হত, আসলে তা নয়। আর কালোজামদিদি?

ছোটবেলাটা আমার জব্বলপুরেই কেটেছে। কলকাতায় এসে যেমন আমার সোনাদি হয়েছে, জব্বলপুরে তেমনি ছিল আমার কালোজামদিদি। সেদিন হঠাৎ রাস্তায় মনোহরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় কালোজামদিদিকে আবার বেশি করে মনে পড়লো।

আমার চরিত্রের একটা মুদ্রাদোষ আছে। হ্যাঁ, মুদ্রাদোষ ছাড়া আর কী বলবো! রাত্রে ঘুম আসবার আগে সারাদিনের ঘটনাগুলো একবার ভেবে নিই। কোন্ লোকের সঙ্গে দেখা হল, কার সঙ্গে কী কী কথা হল, কোন্ নতুন বই পড়লাম, নতুন কী শিখলাম—সমস্ত দিনের লাভ-লোকসানের হিসেবটা এই বিছনায় শুয়ে শুয়ে একবার খতিয়ে নি রোজ। কিন্তু প্রতিদিন এই ধারণা নিয়েই ঘুমোই যে মনে রাখবার মতো কিছুই ঘটেনি, কিছুই করিনি বা শেখবার মতো কিছুই পাইনি। প্রতিদিন একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হয়। তবু চরিত্রের এই মুদ্রাদোষ আজও ছাড়তে পারিনি আমি!

সেদিন কিন্তু এর ব্যতিক্রম হল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়লো, আজ তো সকালবেলা মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মনোহর-দি-মাকালফল! স্কুলে কী আকাট ছিল মনোহর। এখনও কিন্তু

মনোহর চেহারাটা সেইরকমই রেখেছে। নিখুঁত নিভাঁজ স্যুট, সদ্য দাড়ি-কামানো মুখের সেই গ্রীসিয়ান কাট্, একটা পাকও ধরেনি চুলে, দামী সিগ্রেট মুখে! গরীবের ছেলে মনোহর—কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখে তা বোঝবার উপায় ছিল না।

চৌরঙ্গীর একটা হোটেল থেকে বেরুচ্ছিল। প্রথমটায় না চিনতে পারারই কথা। অনেক দিন দেখিনি। আমাকে দেখে থেমে গেল, 'আরে! চিনতে পারিস—?'

ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মনোহর-দি-মাকালফল! কিন্তু হয়ত এখন একটা-কিছু করছে নিশ্চয়ই! এতবড় হোটেলে থাকবার মতো সামর্থ্য তা না হলে হল কী করে! যুদ্ধে অমন কত রত্নই তো তরে গেছে—মনোহরও হয়ত তেমনি একটা কিছু বাগিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে! বলা যায় না!

আমার হাত দুটো ধরে একটা ভীষণ ঝাঁকুনি দিলে মনোহর। বললে, 'ছাড়বো না তোকে আজ—তুই তো রীতিমতো ফেমাস্ হয়ে উঠেছিস রে!'

বললাম, 'কী করছিস আজকাল?'

মনোহর দুটো হাতের পাতা চিত করে কাঁধ দুটো নাচিয়ে বললে, 'কিচ্ছু না।'

তারপর একটা চল্‌তি ট্যাক্সিকে থামিয়ে বললে, 'আয়—চলে আয়।'

অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, 'কোথায়?'

মনোহর বললে, 'আয় না, কোনও কাজ নেই তো তোর—গল্প করবো।'

আরো অবাক হয়ে গেলাম। মনে আছে, আমাদের সকলের দাতব্যের ওপর নির্ভর করেই মনোহরের চলতো। ইস্কুলের জলখাবারটার জন্যে আমাদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে ওকে। জামা কিনে দিত ওর কোন্ মামা, জুতো কিনে দিত ওর কোন্ পিসেমশাই, স্কুলের মাইনেও দিত কোন্ জামাইবাবু। কিন্তু দাতব্যের ওপর নির্ভর করে এই বাবুয়ানি করা একমাত্র বোধহয় ওই মনোহরকেই দেখেছি। কিম্বা হয়ত ওর চেহারার গুণে সাদাসিধে পোশাকও জমকালো হয়ে উঠতো ওর গায়ে।

পকেট থেকে পার্স বা'র করে মনোহর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলে। তারপর একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকে পড়লো আমাকে নিয়ে। লম্বা লম্বা দামী অর্ডারও দিয়ে বসলো। খেতে খেতে আবার বললাম, 'কী করছিস আজকাল ?'

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে মনোহর বললে, 'কিচ্ছু না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'দেখে অবাক্ হচ্ছিস বুঝি, এসব কোত্থেকে আসছে ? তোরা তো বলতিস, মনোহর-দি-মাকাল-ফল। এখন মাকালফলের কদর বেড়েছে রে'।

তবু কৌতূহল মিটলো না। বললাম, 'এসব কার টাকা ? কোত্থেকে পেলি ? কে দিচ্ছে ?'

মনোহর বললে, 'কালোজামদিদি।'

কালোজামদিদি ! কালোজামদিদি বেঁচে আছে এখনও ! সে কত দিনকার কথা।

মনোহর বললে, 'দাঁড়া, পেটে খানিকটা ঢালি আগে, চুমুক দিতে দিতে বলব সব তোকে—সেই গল্প বলতেই তো তোকে ডেকে এনেছি এখানে। তুই খাস তো, না সেইরকম সাধু হয়ে আছিস এখনও ?'

সেদিন রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কালোজামদিদির চেহারাটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। সেই কালোজামদিদি ! এখন বয়স নিশ্চয়ই ষাটের কাছাকাছি। ছোটবেলায় বার বার আমার মনে হত—কালোজামদিদির নামটা কে রেখেছে ! কিন্তু যে-ই রাখুক, তার রসজ্ঞান আছে বলতে হবে। কালোজামদিদিকে দেখতাম বারান্দার ওপর একটা দোলনায় পা ঝুলিয়ে বসে দুলছে। ফরসা ধবধব করছে মুখটা। সামনের বাগানের ওপর আমরা খেলতে খেলতে দেখেছি কালোজামদিদি দোলনায় দুলতে-দুলতে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ফুটবলটা যদি কখনও গড়াতে গড়াতে গিয়ে কালোজামদিদির কাছাকাছি গিয়ে পড়তো, আমি ছুটে যেতাম বলটা কুড়োতে। তার কাছে গেলেই কেমন একটা সুন্দর গন্ধ আসতো নাকে। আজ পর্যন্ত অন্য কারো শরীরে সে-গন্ধ পাইনি। সিল্কের শাড়ির খসখস

শব্দের সঙ্গে সেই সুন্দর সুস্পষ্ট গন্ধ আর কোথাও পাইনি কখনও। বলটা যদি তার পায়ে গিয়ে ঠেকতো কোনদিন তো সমস্ত শরীরে কেমন রোমাঞ্চ হ'ত। ময়লা ধুলোমাখা ফুটবলটাকে বুকে করে বাড়ি ফিরতাম সেদিন।

এক এক দিন কালোজামদিদির মেজাজ কী জানি কেন খুব ভালো হত। আমাদের ডেকে বলতো, 'যে দৌড়ে ফার্স্ট হতে পারবে, তাকে এই কমলালেবুটা দেব।'

আমরা পনরো-যোল জন ছেলে লাইন বেঁধে দাঁড়াতাম। কালোজাম-দিদি সঙ্কেত করলেই সবাই একসঙ্গে দৌড়ুবো। আমার স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ। দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে আমি বিশেষ যেতে পারি না। আমি জানতাম আমি হেরে যাবো। কিন্তু কেন জানি না, ওই কমলালেবুটার লোভে কিনা, কিংবা কালোজামদিদির হাতের ছোঁয়া পাবো বলে কিনা, সমস্ত শরীরে একটা উত্তেজনা অনুভব করতাম।

সত্যি সত্যিই যখন সকলকে হারিয়ে ফার্স্ট হতাম—সে যে কী অনুভূতি! আমার ফার্স্ট হওয়াটা কেউ আশা করেনি। কালোজাম-দিদিও না। তাই মুখটা তত প্রসন্ন নয় তার। তবু মনে আছে, প্রথমবার কালোজামদিদির হাত থেকে কমলালেবুটা নিতে গিয়ে যেন সামলাতে পারিনি। সেই ইজি-চেয়ারে-বসা কালোজামদিদির গায়ের ওপরেই পড়ে গিয়েছিলাম।

কালোজামদিদি হঠাৎ আমাকে ধরে ফেলেছিল। বললে, 'কি রে, এত হাঁপাচ্ছিস কেন?'

আমার তখন বয়েস দশ এগারো বছর আর কালোজামদিদির হয়ত পঁয়ত্রিশ। আমি মুখটা তখনও কালোজামদিদির শাড়ির মধ্যে গুঁজে পড়ে আছি। অতগুলো ছেলের সামনে কালোজামদিদি আমাকে দুই হাতে ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে গাল টিপে দিয়েছিল; বলেছিল, 'কী হাবা ছেলে রে, দিলি তো আমার শাড়ি ময়লা করে?'

সেইদিন থেকে সুবিধে পেলেই কালোজামদিদির কাছে-কাছে ঘোরা-ফেরা করতাম। তারপর একদিন আবার কালোজামদিদি চলে যেত

শ্বশুরবাড়ি। এলাহাবাদে না কোথায় ছিল শ্বশুরবাড়ি। কালোজামদিদির স্বামীকে কখনও দেখিনি। কিন্তু লীলাকে দেখতাম। কালোজামদিদির একমাত্র মেয়ে লীলা। ঠিক যেন কালোজামদিদির ছোট সংস্করণ। আমাদের বয়সী। যখন কালোজামদিদি চলে যেত, কিছুতেই ভালো লাগতো না।

বাড়ির চাকর-বাকরদের জিগ্যেস করতাম, 'কালোজামদিদি কবে আসবে রে?'

জ্যাঠামশাই নিচে নামতেন না। তাঁর কাছে যেতে ভয় করতাম। বিরাট মার্বেল পাথরের বাড়ি। কালোজামদিদি চলে যাবার পর অতবড় বাড়িটা যেন একেবারে জনশূন্য হয়ে যেত। আমরা পাড়ার ছেলেরা জ্যাঠামশাই-এর বাগানে গিয়ে খেলতাম। ওইটেই ছিল খেলার জায়গা। ও-বাড়ির সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের যে কিসের সম্পর্ক তা বোঝা যেত না। তবু জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনের সেই মার্বেল পাথরের বাড়িটার সামনে বাগানটাই ছিল আমাদের সমবয়সী ছেলেদের একমাত্র খেলার জায়গা।

একদিন মনোহর বললে, 'এই, কাল কালোজামদিদি আসছে।'

বললাম, 'কি করে জানলি?'

কিন্তু আর কিছু ভাঙলো না মনোহর। সে-রাতটা যে কী করে কাটলো। কালোজামদিদি আসা মানে আবার সেই রোমাঞ্চ। বাগানের গাছগুলো আবার ছাঁটা হল। ঘর-দোর সাফ করা চলতে লাগলো। জ্যাঠামশাই-এর গলা শোনা গেল দু-এক বার। আর পাখি? পাখিও দেখি যেন সেজে-গুজে বেড়াতে বেরুচ্ছে চাকরের সঙ্গে। কালোজামদিদির নিজেরই ভাই পাখি। আমাদেরই বয়সী। হাবা-গোবা, কথা বলতে পারে না, হাসলে মনে হয় যেন ভেঙচি কাটছে। জ্যাঠামশাই-এর একমাত্র মেয়ে কালোজামদিদি আর একমাত্র ছেলে পাখি। চাকরের সঙ্গে দিনরাত থাকে পাখি। ঐ বিকলাঙ্গ ছেলেটার জন্মের পরেই নাকি কালোজামদিদির মা মারা যায়।

বম্বে-মেল আসবার সময় একলা চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি

স্টেশনের কাছে। কালোজামদিদি এই ট্রেনেই আসবে। কেমন যেন থরথর করে কাঁপছিলাম।

কালোজামদিদি একলা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামলো। আমাকে দেখে বললে, 'কী রে, চিনতে পারিস?'

তারপর পাশে চেয়ে বললে, 'আরে, মনোহর এসেছে যে—আর ফটিক, তুইও?'

চারদিকে চেয়ে দেখি, আমাদের দলের সবাই এসেছে। কেউ কাউকে বলিনি।

কালোজামদিদি আবার বললে, 'বল খেলা আছে বুঝি এদিকে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

ফটিক বললে, 'না কালোজামদিদি, তোমাকে দেখতে এসেছি।'

'তাই নাকি' বলে ফটিকের গালটা জোরে টিপে দিয়ে একগাল হেসে উঠলো কালোজামদিদি।

পাখিকে নিয়ে জ্যাঠামশাই-এর গাড়ি এসেছিল স্টেশনে। কালোজামদিদি তাইতে চড়ে চলে গেল। কিন্তু আমি যেন তখনও কালোজামদিদির গায়ের সেই অদ্ভুত গন্ধ বুক ভরে টানছি।

এক এক বার কালোজামদিদির সঙ্গে লীলাও আসতো। তারপর আমাদের বল খেলা চলতো দ্বিগুণ উৎসাহে। লীলা বুঝি দার্জিলিং না কার্শিয়াং-এ কোন্ মিশনারী স্কুলে পড়তো। ছুটিতে আসতো এলাহাবাদে মায়ের কাছে। যে ক'দিন কালোজামদিদি থাকতো নেপিয়ার টাউনের বাড়িতে, ক'দিন আবার পেতাম সেই গন্ধ। সারা বাড়িটাতে সেই গন্ধ ভুরভুর করতো।

নানা ছুতো করে সকালবেলাও গেছি কালোজামদিদির কাছে। সকালবেলাটা বড় ব্যস্ত থাকতো কালোজামদিদি। জ্যাঠামশাইএর চাকর দুখ্‌মোচন একটা শিলের ওপর অনেকগুলো কমলালেবু বাটছে। খোলাসুদ্ধু সেই কমলালেবুর রস গরম জলে সেদ্ধ হবে, আর তাই দিয়ে কালোজামদিদি স্নান করবে। অলিভ-অয়েল থাকতো বোতল ভরা।

সেই অলিভ-অয়েল মাখা চলতো সকালবেলা তু'ঘণ্টা ধরে, তারপর সেই কমলালেবুর রস মাখানো গরম জলে স্নান। বাথরুমে যে কত রকমের সাবান! স্নান করতে যাবার মুখে তোয়ালে নিয়ে কালোজদিদির আয়া দাঁড়িয়ে থাকতো বাথরুমের দরজায়। তারপর সেই স্নান চলতো বেলা দশটা পর্যন্ত। যখন বেরুত কালোজামদিদি, সে এক অন্য মানুষ!

বাড়ির মধ্যে আমাকে দেখে কালোজামদিদি জোরে গাল টিপে দিত, 'হাঁ করে কী দেখছিস রে হাবা ছেলে—লেখাপড়া নেই? স্কুলে যাবি না?'

'বা রে, আজ যে রোববার।'

তখনকার সেই অল্পবয়েসে মনে আছে—আমাদের সকলের কাছে কালোজামদিদি ছিল একটা স্বপ্ন, একটা বিস্ময়! লেখাপড়া, ঘুম, খেলা সমস্তর মধ্যে কালোজামদিদি কেমন আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। কালোজামদিদিকে ঘিরেই আমাদের কল্পনা, তাকে নিয়েই আমাদের স্বপ্ন। বাড়িতে পড়তে বসেও হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। মনে হত, কালোজামদিদির সেই ফরসা, টোপা কুলের মতো ফোলা-ফোলা হাতের আঙ্গুল দেখছি যেন। কালোজামদিদির সেই ঢেউ-খেলানো চুলের রাশ, সেই সিল্কের শাড়ির খসখস শব্দ, সেই অদ্ভুত গায়ের গন্ধ—সারা দিন, সারা রাত আমাদের মনকে মুখর করে রাখতো।

কালোজামদিদির আঙ্গুলে বোধহয় খুব জোর ছিল, নইলে আমাদের গাল টিপলে অত লাগতো কেন? তবু কালোজামদিদি যেদিন গম্ভীর হয়ে থাকতো, সেদিন চেয়েও দেখতো না আমাদের বল খেলা। যেদিন গাল টিপতে ভুলে যেত, সেদিন ভারি খারাপ লাগতো আমাদের। কিছুতেই কিছু ভালো লাগতো না আর যেন।

কিন্তু একদিন খেলতে গিয়ে কেমন যেন অবাক্ লাগলো। পাখি চাকরের সঙ্গে আর বেড়াতে বেরোল না সেদিন। বাড়ির দরজা-জানলা-গুলোও খোলা হয়নি। সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। চাকর-বাকরদের গলাও যেন শোনা যাচ্ছে না।

মনোহর বললে, 'শুনেছিস, কালোজামদিদির বর মরে গেছে।'

'সে কি !'

মনোহর বললে, 'হ্যাঁ, শুনেছি আমি। টেলিগ্রাম এসেছে, হঠাৎ হার্টফেল করে মরে গেছে। কালকে এখানে চলে আসছে কালোজামদিদি।'

সেদিন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কী কান্নাটাই না কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম জানি না। মনে হল, পিসীমা যেমন পিসেমশাই মারা যাবার পর সাদা কাপড় পরেছিল, মাছ-মাংস খায় না, কালোজামদিদিও যদি সেই-রকম করে! পিসীমাকে বিধবা হওয়ার পর যেমন কাঁদতে দেখেছিলাম, কালোজামদিদিকেও যেন কল্পনায় সেইরকম কাঁদতে দেখলাম।

আমি আর মনোহর সেদিন আবার স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ ছলছল করছিল আমার। বিধবার পোশাক-পরা কালোজামদিদিকে প্রথম দেখে কী করে যে কথা বলবো তাই ভাবছিলাম।

বম্বে-মেল এল।

বুক ত্বরত্বর করে কাঁপছিল। কী দৃশ্য দেখবো কে জানে!

দেখলাম, কালোজামদিদি নামছে। চোখত্বটো বুঁজে ফেললাম আমি। আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

কিন্তু কালোজামদিদি আমায় দেখতে পেয়েছে ঠিক। সামনে এসে আমার আর মনোহরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে, 'আমাকে দেখছি ভুলিসনি তোরা? ওঠ, গাড়িতে ওঠ।' বলে কালোজাম-দিদি আমাদের পাশে বসিয়ে নিলে। মুখ উঁচু করে দেখতে সাহস হচ্ছিল না! তবু কালোজামদিদির শিল্কের শাড়ির খসখস শব্দ আর সেই অদ্ভুত গন্ধের মধ্যে বিভোর হয়েছিলাম। কালোজামদিদির একেবারে গা ঘেঁষে বসেছি। আমাদের ত্বজনকে ত্ব'হাত দিয়ে ধরে আছে। গাড়িটা পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে শাঁ-শাঁ করে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দেয়, আর আমরা তিনজনেই একসঙ্গে তুলে উঠি। কালোজামদিদির হাতের সোনার চুড়িগুলো আমার বুকের ওপর ফুটছে, লাগছেও খুব, তবু নড়তে সাহস হল না। যদি কালোজামদিদি হাত ছাড়িয়ে নেয়। মনে হল, এমনি করে যদি মাইলের পর মাইল তুলতে তুলতে যাওয়া যেত, বেশ লাগতো। আমি এক

সময়ে সেইভাবে থাকতে-থাকতে হঠাৎ কালোজামদিদির কোলের ওপর সিল্কের শাড়িটার মধ্যে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

কালোজামদিদি আরো জোরে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে আমায়।

বললে, 'এ কী হাবা ছেলে দেখো—ছি, কাঁদতে নেই অমন করে!'

দিদির সান্ত্বনাতে আমার কান্না আরো বেড়ে গেল।

সেদিন মনে আছে বাড়ি আসার পথে খুব কাঁদছিলাম দেখে মনোহর বলেছিল, 'কাঁদছিস কেন রে, ভালোই তো হল!'

বললাম, 'কেন?'

মনোহর বললে, 'এবার থেকে আর কালোজামদিদি কোথাও যাবে না, এইখানেই থাকবে।

মনোহরের কথায় আমারও যেন কেমন আনন্দ হল। স্বার্থপরের মতো ভাবলাম: বেশ হল, ভালোই তো হল! বরাবর কালোজামদিদি এই নেপিয়ার টাউনের বাড়িতেই থাকবে, রোজ দেখতে পাবো তাকে, রোজ আমাদের গাল টিপে দেবে কালোজামদিদি।

সত্যি যা ভেবেছিলাম তাই হল। কালোজামদিদি বিধবা হবার পর যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো আমাদের। কালোজামদিদিকে আরো সুন্দর দেখাতে লাগলো। আরো মিষ্টি। আরো নিজেদের জিনিস। ও-বাড়িতে যাওয়া আরো বেড়ে গেল আমাদের। সকালবেলা আরো বেশি করে কমলালেবু আসে। দুখ্‌মোচন আরো কমলালেবু বাটে, দুধের সর দিয়ে কমলালেবু বেটে গায়ে মাখে কালোজামদিদি। তারপর দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলে সবটা। আর তারপর গরম জলে স্নান। বাথরুমের বাইরে দাঁড়ালে কেমন ভুরভুর করে গন্ধ আসে নাকে। তারপর স্নান সারা হবার পর ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে সিল্কের রঙিন শাড়ি পরে দোলনায় বসে দোলা খায়।

আমাদের দল ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। আগে পনরো-ষোল জন ছিলাম, এখন আমাদের ক্লাসের অন্য ছেলেরাও আসতে আরম্ভ করল। মধু, মান্‌কে, দীপচাঁদ—ওরাও আসতে সুরু করেছে। ছুটির দিন দল আরও

ভারী হয়। গোলবাজার থেকে সাইকেলে করে আসে হাবুল। এতোয়ারী বাজার থেকে আসে পঞ্চা। কালোজামদিদি সকলেরই গাল টিপে দেয়। সকলকেই সমান আদর করে। কার ওপর যে বেশি পক্ষপাতিত্ব বোঝা যায় না। দিন-রাত চেষ্টা করি কেমন করে বেশি প্রিয়পাত্র হতে পারি কালোজামদিদির।

ভোরবেলা কালোজামদিদির ঘুম ভাঙবার আগেই ও-বাড়িতে গিয়ে তার শোবার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকি। ঘুম থেকে উঠলেই দেখতে পাবে আমাকে। একলা আমাকে। এত সকালে আর কেউ আসতে পারে না। কতদিন মা বকেছে, দাদারা মেরেছে—কিছুতেই কেউ বশে আনতে পারেনি আমাকে। আমাদের দলের সব ছেলেরা একই আকর্ষণে আসে এখানে। এত ছেলে যে, বাগানে ধরে না। নেপিয়ার টাউনের মার্বেলের বাড়িটা আমাদেরই মতো বাচ্চা ছেলেদের ভিড়ে দিন-রাত উচ্চকিত থাকে।

কালোজামদিদির সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখ। কোঁকড়ান চুলের রাশ। ভারি ভালো লাগল দেখতে। হাসতে হাসতে কালোজামদিদি বললে, 'কী রে, এত সকালে যে ? রাত্রে বুঝি স্বপ্নে দেখেছিলি দিদিকে ?'

লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। বললাম, 'তুমি দুলবে না ?'

কালোজামদিদি হেসে আমার গাল টিপে দিলে। বললে, 'তুই দোলাবি বুঝি ?'

বললাম 'হ্যাঁ।'

কালোজামদিদি বললে, 'আচ্ছা, এখন দোলা তুই, কিন্তু দুপুরবেলা আজ হাবুল দোলাবে। ওকে আমি কথা দিয়েছি, ও অনেক দূর থেকে আসে।'

'আর বিকেলবেলা আমি দোলাবো তোমায় ?'

'বিকেলবেলা আজ পঞ্চা দোলাবে, ও সেই এতোয়ারী বাজার থেকে আসে।'

শেষকালে কালোজামদিদিকে নিয়ে আমাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতি-যোগিতা হতে আরম্ভ হল। ঝগড়া সুরু হল, কে কালোজামদিদিকে দোলাবে তাই নিয়ে। ফুটবল খেলা আমাদের উঠে গেল।

কালোজামদিদি বললে, 'মনোহরটা তো ভারি ফাঁকিবাজ—মনোহর-দি-মাকালফল।'

তারপর-থেকেই কালোজামদিদির দেওয়া নামটা ধরেই আমরা ডাকতাম মনোহরকে বরাবর।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে বললাম, 'কাল যাসনি কেন রে কালোজামদিদির বাড়িতে?'

মনোহরের বেশ মন খারাপ দেখলাম। বললে, 'ভাই, একটা পয়সাও যোগাড় করতে পারলাম না কোথাও। মামার কাছে গিয়েছিলাম, পিসেমশাই-এর বাড়ি গিয়েছিলাম, জামাইবাবুর কাছেও গেলাম—জানিস সকলেরই মাসের শেষ দিক। শুধু-হাতে যেতে কেমন লাগলো আমার।'

বললাম, 'কালোজামদিদি কালকে তোকে মনোহর-দি-মাকালফল বলেছে।'

মনোহর বললে, 'শুনেছি আমি। কিন্তু কালোজামদিদিরই তো দোষ, বেছে বেছে মাসের শেষের দিকে ওর জন্মদিন পড়ে কেন?'

এমনি করে বেশ দিন কাটছিল। কিন্তু বাধা পড়লো একদিন।

লীলা লেখাপড়া শেষ করে নেপিয়ার টাউনের বাড়িতে এসে উঠলো। আর কোথা থেকে এক দৈব-দুর্বিপাকে কী হয়ে গেল সব, আজও ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

রোজকার নিয়মমতো সেদিনও আমরা গেছি কালোজামদিদির বাড়ি। বাইরে দেখলাম, বিরাট একটা মোটর। নতুন ঝকঝকে মোটর। ড্রাইভার নেই।

সামনেই দুখ্‌মোচনের সঙ্গে দেখা হল। বললাম, 'কে এসেছে রে?'

দুখ্‌মোচন বললে, 'বাজোরিয়া সাহেব।'

কে বাজোরিয়া সাহেব! কেন এসেছে! এই সব প্রশ্ন করছিলাম নিজেদের মধ্যে। আমাদের কালোজামদিদিকে কেড়ে নেবে নাকি! নিয়মমতো বাড়ির ভেতরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি কালোজামদিদি লীলাকে সঙ্গে করে আসছে। সঙ্গে একজন স্যুট-পরা লোক। লম্বা-চওড়া,

হোমরা-চোমরা চেহারা। ছোকরা মানুষ। বেশি বয়েস নয়! কালোজামদিদি এক হাতে লীলার একটা হাত ধরেছে, আর একটা হাত সেই লোকটার কাঁধের ওপর।

তিনজন মিলে মটরে উঠতে যাচ্ছিল। আমাদের দেখে কালোজামদিদি এগিয়ে এল। বললে, 'তোরা এসে গেছিস, বোস একটু, আমি মিস্টার বাজোরিয়ার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি। চলে যাসনে যেন, আধ-ঘণ্টার মধ্যেই আসবো।'

তারপর তিনজনে গিয়ে উঠলো মোটরে। মোটরটা একবার একটু মৃদু আর্তনাদ করে ছেড়ে দিলে।

আমরা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম! কোথাকার কে এসে আবার ভাগ বসালে আমাদের কালোজামদিদির ওপর। কে ও! কী চায়? মন খারাপ হয়ে গেল সকলের। সবাই রয়েছি, কিন্তু কালোজামদিদির অবর্ত-মানে যেন সব অর্থহীন হয়ে গেল!

আধঘণ্টা কেটে গেল। একঘণ্টাও কেটে গেল। রাত আটটা বাজতে চললো, তবু কালোজামদিদির দেখা নেই। গোলবাজারের হাবুল সাইকেলে চড়ে চলে গেল। এতোয়ারী বাজারের পঞ্চাও আর থাকতে পারলো না। একে একে সবাই চলে গেল। সবারই মনের ভাব: কাল কালোজাম-দিদির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে হবে। কালোজামদিদি সত্যিই আমাদের চায়, না, ওই বাজোরিয়া সাহেবকে চায়। স্পষ্ট জবাব চাই!

আমি বাড়ি যাবার পথে পা দিয়েও বাড়ি ঢুকতে পারলাম না। অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আবার কালোজাম-দিদির বাড়ির সামনে এসে হাজির। মোটরটা নেই আর তখন। তাহলে কি তারা এখনও ফেরেনি?

কালোজামদিদি খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছে। তখনও ঘুমোতে যায়নি। বললে, 'কি রে এত রাত্তিরে?'

কালোজামদিদিকে দেখে আমি আর সামলাতে পারলাম না! দিদির শাড়ির আঁচলটা নিয়ে মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

দিদি বললে, 'কী হাবা ছেলে রে, আমার দেরি হয়েছে বলে বুঝি দুঃখু হয়েছে ? ওরা সব কোথায় ?'

দিদি আবার বললে, 'তোরাই তো আমার প্রাণের বন্ধু রে, ও লোকটা তো নতুন এসেছে—লীলার সঙ্গে বিয়ে হবে কিনা ওর—তাই ওর সঙ্গে একটু ভাব করছিলাম।'

আশ্চর্য আমার মন। কালোজামদিদির ওইটুকু কথাতেই মন একেবারে ভিজে গেল। এত যে অভিমান অভিযোগ, সব মুছে গেল! এক মুহূর্তে ক্ষমা করে ফেললাম কালোজামদিদিকে! নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার চোখ-মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, 'যা, অনেক রাত হল, এবার বাড়ি যা লক্ষ্মীটি—কাল সকাল-সকাল আসিস।'

কিছুদিনের মতো এ ব্যাপারটা মিটে গেল বটে, কিন্তু সাত দিন পরেই আবার ওই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। আবার বাজোরিয়া সাহেব এল। আবার মোটরে করে বেরিয়ে গেল তিনজনে। বাজোরিয়া সাহেবের সঙ্গে লীলার বিয়ে হবে তো হোক না, কিন্তু কালোজামদিদি ওদের সঙ্গে যাবে কেন ? শেষে মাসের মধ্যে ছ'দিন সাতদিন আসতে লাগলো বাজোরিয়া সাহেব। নিজে মোটর চালিয়ে আসে। আবার কালোজামদিদিকে আর লীলাকে বেড়িয়ে নিয়ে এসে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যায়।

মনোহর বললে, 'খবর পেয়েছি, ও লোকটা সাতনার ম্যাজিস্ট্রেট, নতুন আই. সি. এস—

ফটিক সেদিন স্পষ্টাস্পষ্টি বললে, 'তোমাকে সত্যি করে বলতে হবে কালোজামদি, তুমি আমাদের, না, ও লোকটার ?'

কালোজামদিদি দোলনায় দুলতে-দুলতে ফটিকের গাল টিপে দিলে। বললে, 'দুর্ বোকা ছেলে, ও-কথা বলতে আছে ? আমি হলুম তোদের দিদি আর ও-লোকটার শাশুড়ী। কিচ্ছু বুঝিস না, ও যে আমার জামাই হবে রে।'

কিন্তু দিন দিন বাজোরিয়া সাহেবের আসা বাড়তে লাগলো। কোথায় সেই সাতনা! সেই একশো মাইল দূর থেকে লীলার জন্যে মোটর চালিয়ে আসে, আবার সেই রাত্রেই ফিরে যায়! রবিবার দিন সকালবেলাই চলে

আসে। সমস্ত দিনটা কাটায় এখানে। খাওয়া-দাওয়া করে। মার্বেল রক্স্ দেখতে যায় দুইজনকে নিয়ে। আস্তে আস্তে সত্যিই আমরা যেন পর হয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারি।

কালোজামদিদি কিন্তু মুখে বলে, 'এই ছাখ না, সামনের বোশেখ মাসে লীলার বিয়েটা হয়ে যাক্, তখন আবার সারাদিন তোদের সঙ্গে কাটাবো—আবার তোরা আমাকে দোলাবি আগের মতন।'

আমরা কেবল দিন গুনি। কবে বোশেখ মাস আসবে। কবে বিয়েটা হয়ে যাবে ওদের। বাঁচা যায় তা হলে। তখন আবার কালোজামদিদি আমাদের।

কালোজামদিদি একদিন বললে, 'আচ্ছা, এত যে তোরা আমাকে ভালবাসিস, তোদের যখন বিয়ে হবে আমাকে ভুলে যাবি তো?'

আমরা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠি, 'কখ্খনো না, কালোজাম-দিদি—কখ্খনো না।'

সত্যিই তো, কালোজামদিদিকে কি ভোলা যায়? তুমি আমাদের ভালবাসো আর না-বাসো, তোমাকে ভাল না-বেসে কি থাকতে পারি? কালোজামদিদিকে না দেখে যে বাঁচতে পারা যায়, এ কথা তখন কল্পনা করতেও ভয় হয়। এখন মনে পড়লে হাসি পায় অবশ্য! কিন্তু তখন কি ছেলেমানুষই যে ছিলাম আমরা!

দেখতে দেখতে একদিন সেই বোশেখ মাস এলো। বিয়ের তোড়-জোড় চলেছে। রোজই দেখি বাজোরিয়া সাহেব আসে! খাওয়া-দাওয়া করে, তারপর বাজারে যায় জিনিসপত্র কেনা-কাটা করতে।

বোশেখ মাস পড়তেই কালোজামদিদি একদিন লীলাকে নিয়ে চলে গেল সাতনায়! যাবার আগের দিন বলে গেল, 'লীলার বিয়েটা দিয়েই চলে আসবো। তোরা আমায় ভুলে যাবি না তো?'

তা এতদিন যখন সহ্য হল, এ ক'টা দিনও সহ্য হবে। কালোজামদিদি মেয়েকে নিয়ে সাতনায় চলে গেল। বিয়েটা বিলিতী মতে হবে কিনা, তাই বরের বাড়িতেই গেল কালোজামদিদি।

সাতনায় কী ঘটলো আমরা জানতে পারিনি। বোশেখ মাসটা কেটে গেল, তবু কালোজামদিদি আসে না। জ্যৈষ্ঠ মাসটাও কাটতে চললো, তবু আসে না কালোজামদিদি। আমরা মন-মরা হয়ে থাকি। কালোজামদিদির বাড়িতে যাই, সব ফাঁকা লাগে। খালি দোলনাটা ঝোলে, সেটাই খানিকটা দোলাই।

ফটিক বললে, 'কালোজামদিদিকে একটা চিঠি দেব।'

'ভালো কথা! কিন্তু ঠিকানা কোথায় পাবি?'

ঠিকানাও যোগাড় হল। কিন্তু কী লিখবো। খাতার পাতায় কেবল লিখতে লাগলাম, 'কালোজামদিদি, তোমার জন্যে আমার মন কেমন করছে।' পাতা ভর্তি করে লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। লজ্জা হয়, পাছে কেউ দেখে ফেলে।

কালোজামদিদির ওপর ভীষণ রাগ হল আমার! বাজোরিয়া সাহেবের বাড়ি গিয়ে আমাদের একেবারে ভুলে গেছে। দরকার নেই। আমরাও রাগ করতে জানি! লিখবোই না চিঠি। এখানে এলে কথাই বলবো না। এবার মিষ্টি কথায় আর ভুলছি না আমরা।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ মনোহর আমাদের বাড়িতে দৌড়ে এসেছে। বাইরের ঘরের দরজায় এসে আস্তে আস্তে টোকা মারলে।

বললাম, 'কে রে?'

'একবার বাইরে আয় তো, কথা আছে।'

বাইরে আসতে মনোহরের মুখখানার ভাব দেখে চম্‌কে উঠলাম।

মনোহর প্রথমেই বললে, 'ভাই, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী সর্বনাশ?'

'কালোজামদিদি বিয়ে করেছে!'

'কাকে?'

'বাজোরিয়া সাহেবকে।'

মনোহরের কথাগুলো কাঁপছিল। হতাশ হয়ে আমাদের বাড়ির সদর দরজার ওপরই বসে পড়লো সে। বললে, 'কী হবে আমাদের?'

আমিও যেন কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। সত্যিই, কী হবে আমাদের!

মনোহর বললে, 'চল্, হাবুলকে গিয়ে ডাকি—সে হয়ত কিছু বুদ্ধি দিতে পারে।'

সেই রাত্রেই হাবুলের কাছে গেলাম। সে সব শুনে বললে, 'জ্যাঠা-মশাই খবর পেয়েছে?'

মনোহর বললে, 'নিশ্চয় পেয়েছে।'

'আর লীলা? কালোজামদিদির মেয়ে—সে?'

প্রথমে টের পাওয়া যায়নি। ক'দিন থেকেই পাখিকে নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না। হাবা-গোবা ছেলে, কোথায় গেল সে। রাস্তা-ঘাট চেনে না। চারিদিকে খোঁজ-খবর নেওয়া হল। পুলিশে খবর দেওয়া হল। শেষে বাগানের মালিই দেখতে পেলে, পাখিটা বাড়ির মজা কুয়োর মধ্যে মরে পড়ে আছে। আমরাও আশ্চর্য হলাম বৈকি! কালোজামদিদির কাণ্ড দেখে সে-ও বুঝি লজ্জা ঢাকবার আর জায়গা পায়নি। খবরটা শুনে পঞ্চা বললে, 'বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে—'

আরো ভীষণ খবরটা দু-তিন দিন পরে এল।

লীলা, মিশনারী স্কুলে পড়া মেয়ে লীলাও, মার কাণ্ড দেখে নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে।

আমাদের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগলো, কেন কালোজামদিদি বিয়ে করতে গেল বাজোরিয়া সাহেবকে। আমাদের নিয়ে কি কালোজামদিদির সুখে দিন কাটছিল না। কালোজামদিদির জন্যে আমার যেন কেমন মায়া হতে লাগলো।

মনোহর কিন্তু বললে, 'বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে—যেমন আমাদের মনে কষ্ট দেওয়া!'

আমি কিন্তু তবু কাউকে না বলে চুপি-চুপি এক এক দিন কালোজাম-দিদির ফাঁকা বাড়িটায় যাই। বাথরুমটা থেকে সে-রকম গন্ধ আর আসে

না। আর দুধের সর দিয়ে কমলালেবু বাটে না দুখ্‌মোচন। দোলনাটা বারান্দার মাঝখানে স্থির হয়ে আছে। সব যেন কেমন হতবাক্ হয়ে গেছে। শুধু উঁকি মেরে দেখি, জ্যাঠামশাই তাঁর ঘরে খাটের ওপর চিতপাত হয়ে শুয়ে আছেন! ওইসব দুর্ঘটনার পর আর ওঠবার শক্তি নেই যেন তাঁর।

কালোজামদিদির অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলটাও যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আমরাও আস্তে আস্তে বড় হলাম। মনও আমাদের বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সমস্যা বাড়তে লাগলো। কেউ কেউ ফেল্ করলাম জীবনে, কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম সংসারে। ছোটবেলাকার ছোট ছোট শখ, ছোট ছোট সাধ কোনো:দিন পূর্ণ হয়নি বলে আর কোনো ক্ষোভই রইল না পরবর্তী জীবনে। বাস্তব পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম সব। মানে বদলে গেল সব জিনিসের। মূল্যমানের পরিবর্তন হল। আমাদের দল ছিল এক, হল বহু। কারোর সঙ্গে অন্য কারোর মতে মেলে না আর। কলকাতায় এসে আবার নতুন বন্ধুর দল জুটে গেল।

সেই হট্টগোলের মধ্যে ছোটবেলাকার স্বপ্ন 'কালোজামদিদি' যে তলিয়ে যাবে তা আর বিচিত্র কী!

আমি ছিট্‌কে এসেছিলাম কলকাতায়। একবার যেন খবরও পেয়েছিলাম—বাজোরিয়া সাহেব মারা গেছে, কালোজামদিদি আবার বিধবা হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না তখন। সে-ও প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর হয়ে গেল।

কিন্তু এতদিন পরে, যখন স্মৃতি থেকে কালোজামদিদি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, মনোহরের সঙ্গে দেখা হতেই আবার সব মনে পড়ে গেল।

হাব-ভাব দেখে মনে হল, মনোহর বেশ সুখেই আছে। কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। একটার পর একটা জিনিস আসতে লাগলো। মনোহর খেয়েই চলেছে! তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, 'কেন খাচ্ছিস না বল তো—কালোজামদিদির টাকা ব'লে?'

আমি এর কী উত্তর দেব। বললাম, 'না, তা নয়—'

মনোহর বললে, 'এ টাকা একরকম আমারই বলতে পারিস—কালোজামদিদি যে উপকার পায় আমার কাছ থেকে, তার তো একটা দাম আছে?'

'কিসের উপকার?' জিগ্যেস করলাম।

মনোহর যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, 'তা ছাড়া, কালোজামদিদির অত টাকা খাবে কে? ছেলে আছে, না মেয়ে আছে? বাবার সমস্ত সম্পত্তি আর বাজোরিয়া সাহেবের সম্পত্তি, সব সে পেয়েছে। জব্বলপুরে নেপিয়ার টাউনে যদি যাস কোনদিন তো সে-বাড়ি দেখে চিনতে পারবি না —সে এক বিরাট মার্বেল প্যালেস।'

এতক্ষণে খাওয়া সেরে মনোহর গেলাস নিয়ে বসলো। বললে, 'তা ভগবান সত্যি সত্যি আছে ভাই, সেই ছোটবেলায় আমাদের যেমন কষ্ট দেওয়া, তেমনি এখন ভুগছে খুব।'

বললাম, 'সে কী? কালোজামদিদির অসুখ নাকি?'

'সে এক অদ্ভুত অসুখ ভাই, আজ সাড়ে চার বচ্ছর কালোজামদিদি ঘুমোয়নি। কোনও ডাক্তার আর কোনও ওষুধ বাকি নেই। গেল বছরে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিল, কিন্তু যে-কে সেই। মোটে ঘুম আসে না— ডাক্তাররা বলে, এ-রোগ সারবে না। তবে একটা কাজ করলে অনেক দিন বাঁচবে আরো—দিন-রাত কমবয়েসী ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হবে। কিন্তুরা সাদিন-রাত ওই ছেষট্টি বছরের বুড়ীর সঙ্গে কে মিশবে বল্—কুড়ি-বাইশ বছরের বেশি হলে চলবে না আবার।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললাম, 'সত্যি?'

মনোহর বললে, 'হ্যাঁ, এর একবর্ণও মিথ্যে নয়—তাই কালোজামদিদি আমাকে রেখেছে, পাঁচশো টাকা মাইনে দেয়, আর আমারও চাকরি-বাকরি ছিল না, একটা হিল্লে হ'য়ে গেল। আমি ছোকরাদের যোগাড় করে আনি, তারা দিন-রাত কালোজামদিদিকে ঘিরে থাকে সব সময়, কালোজামদিদি বুঝতে পারে সব, তাই রেট বেঁধে দিয়েছে, দিনের বেলা পাঁচ টাকা করে আর রাত্রের জন্যে দশ টাকা—রাত্তির বেলাতেই কষ্ট

কি না! কালজামদিদি দোলনায় বসে থাকবে আর সবাই দোলাবে, কিংবা তাস খেলবে, গল্প করবে—তবে কুড়ি-বাইশ বছরের কম বয়স হওয়া চাই ছেলেদের!

'এরকম কত ছেলে আছে?'

'তা জন কুড়ি-পঁচিশ হবে, সবাই কি থাকতে চায়,—বুড়ীর সঙ্গে সারাদিন থাকা, এও একটা পাপ বৈকি! আমি ব্যাচ-সিস্টেম করে দিয়েছি—রাত্রের ব্যাচ, দিনের ব্যাচ আলাদা আলাদা।'

মনোহরের দিকে নির্বাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। কী প্রচণ্ড শাস্তি কালোজামদিদির! ভাবতে গিয়েই কালোজামদিদির ওপর কেমন মায়া হচ্ছিল।

রাত হয়ে আসছে। যাবার সময় মনোহর বললে, 'আসছে শনিবার কালোজামদিদির জন্মদিন, কী উপহার দেওয়া যায় বল্ তো? উপহারটা কিনতেই কলকাতায় আসা।'

'কত দামের মধ্যে?'

'ধর, হাজার টাকার মধ্যে।'

চম্‌কে উঠলাম। এত টাকার উপহার দেবে মনোহর!

মনোহর হো-হো করে হেসে উঠলো, 'আরে, টাকা কি আমার নাকি? উপহার দেবার জন্যে কালোজামদিদিই যে টাকা দিয়েছে। বলে দিয়েছে,—এমন জিনিস দিবি যেন দশজনে ভালো বলে। আর শুধু কি আমাকে একলা? কালোজামদিদি সকলকে টাকা দেয়—গাঁটের পয়সা খরচ করে কে আর ওই বুড়ীকে উপহার দিতে যাবে বল্—কেউ তো আর পাগল নয়?'

আর একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠতে যাচ্ছিল মনোহর।

বললাম, 'আর একটা কথা, বিয়ে-থা করেছিস তুই?'

মনোহর সাপ দেখে আঁতকে ওঠার মতো ভঙ্গী করে বললে, 'ওরে বাবা, তা হলে চাকরি চলে যাবে আমার!'

গল্পটা শুনে সোনাদি সেদিন কিছু বলেনি প্রথমে।

জিগ্যেস করলাম, 'কেমন লাগলো, সোনাদি?'

সোনাদি বললে, 'এত অল্প বয়সে বিকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস, কিন্তু বিকৃতিটাই তো মানুষের প্রকৃতি নয়। বিকৃতি হল প্রকৃতির বিকার। লেখকের যখন দৃষ্টি খণ্ডিত থাকে তখনই সে এইরকম বিকৃতি নিয়ে মাথা ঘামায়। একে বৈচিত্র্য বলে না—। একে বলে পশ্বাচার। বড় হয়ে তন্ত্র পড়লে বুঝবি শক্তি-উপাসনা মোটামুটি দু'রকমের। এক বীরাচার আর দুই পশ্বাচার। লেখকদের মধ্যে এই দুই রকমের জাত আছে। কিন্তু তুই বীর সাধক হতে চেষ্টা কর। তবেই নাম হবে। বড় বড় লেখকদের লেখা পড়তে হবে। শুধু নিজের চরিত্র দেখে বেড়ালেই চলবে না। ষট্‌চক্রভেদ শিখতে গেলে যে গুরু চাই।...'

এমনি কত উপদেশ দিত সোনাদি। চুল এলিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসে বসে আপন-মনে বলে যেত সোনাদি আর আমি চেয়ে দেখতাম আর শুনতাম।

বলতো, নজর রাখবি বৃহতের দিকে, ভূমার দিকে। সাধকের সঙ্গে লেখকের কোন তফাত নেই। যে-লেখকরা সাধক হতে পেরেছে তারাই ঋষি। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

বিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

যে ব্রহ্ম দেখতে পেয়েছে তার অবিদ্যা চলে যায়, তখন আর কোনও মায়া থাকে না তার। তখন রামপ্রসাদের মতো সে বলতে পারে—

ইহ জন্ম পর জন্ম ' বহু জন্ম পরে
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় শ্বেতকেতু পিতাকে জিগ্যেস করেছিলেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি—

হে ভগবান, কী সে জিনিস যা জানলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না?...

সোনাদি দর্শন-শাস্ত্র পড়েছিল বাবার কাছে কত বছর ধরে। স্বামীনাথ বাবুর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সোনাদি কেবল পড়াশোনা নিয়েই মেতে

ছিল। বিশ্বেশ্বরবাবু নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন একমাত্র মেয়েকে। আজমীরের শুকনো হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠেছিল সোনাদি। কিন্তু তা বলে মনের রসকষ শুকিয়ে যায়নি একেবারে। বেদ-উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় এক বিচিত্র বিশ্বাস মনের সমস্ত ভিত্তিমূলকে একেবারে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। সেখান থেকে যেন নড়চড়ের কোনো ভয় ছিল না আর। ছোটবেলাকার সেই শিক্ষা, অপরিণত মনের সেই গ্রহণ, সারা-জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিয়ে হল, তবু সে-বিশ্বাস বদলালো না কোনদিন।

বিশ্বেশ্বরবাবু মারা যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন, 'অভেদে ভেদ না-দেখে ভেদের মধ্যে অভেদকে দেখবে মা, কেবল বাদীর দর্শন ভেদেই তার যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ—'

বিয়ের পর স্বামীনাথবাবু একদিন বললেন, 'এখানে কি তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

নতুন বধূ বললে, 'অসুবিধে হবে কেন?'

'কাল রাত্রে দেখলাম তুমি ঘরে শুতে আসোনি।'

'পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেল, তারপর ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তুমি কি রাগ করেছিলে?'

'না, প্রথমে খেয়ালই হয়নি, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নজরে পড়লো আমি একলা শুয়ে আছি ঘরে।'

'একলা শুতে যদি তোমার সুবিধে হয় তো, আমি না-হয় দক্ষিণের ঘরেই শোব এবার থেকে।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'দক্ষিণের ঘরে যদি শোও তো মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিয়ো চারদিকে, ও-ঘরে একটু মশা আছে।'

'ঘুমোব আর কতটুকুই বা, বই পড়তে-পড়তেই তোর রাত তিনটে বেজে যায়।'

'রাত জেগে পড়া কি ভালো?'

'আমার যে রাত জেগে পড়াই অভ্যেস।'

'অভ্যেসটা ত্যাগ করতে চেষ্টা করো, ওতে শরীর খারাপ হয়।'

এমনি করেই সূত্রপাত হয়েছিল। খুব সহজ স্বাভাবিক আরম্ভ। ঠিক বিরোধ নয়। আবার যেন ঠিক অনুরাগও নয়। বাইরের লোক যে দেখতো সে-ই অবাক্ হয়ে যেত।

ননদরা বলতো, 'হ্যাঁ বৌদি, দাদা না-হয় মাটির মানুষ, কিন্তু তোমার আক্কেলখানা কী?'

সোনাদি বই থেকে মুখ তুলে বলতো, 'কিসের আক্কেল, ঠাকুর-ঝি?'

'তোমার বই পড়তে এত ভালোও লাগে! আমাদেরও তো বিয়ে হয়েছে, আমরাও তো বই পড়ি, কিন্তু বিয়ে হবার পর···'

সোনাদি বলে, 'কিন্তু এ-সব বই তো তোমার দাদারই কিনে দেওয়া।'

'তুমি বই পড়তে ভালোবাসো দাদা জানতে পেরেছে, তাই···কিন্তু তা বলে সারাদিন বই মুখে দিয়েই থাকবে?'

'এ-বইটা যদি পড়ো ঠাকুর-ঝি তো তুমিও নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে, এমন বই।'

'আমাদের সংসার-ধর্ম আছে বৌদি, আমাদের বই নিয়ে থাকলে চলে না।'

সোনাদি হেসে উঠলো, 'আর আমার বুঝি সংসার-ধর্ম নেই?'

'সংসার-ধর্ম থাকলে আর এমন বই নিয়ে মেতে উঠতে পারতে না,··· তা দাদার সঙ্গে তোমার ক'দিন কথাবার্তা নেই শুনি?'

'ওমা, সে কী কথা, এই তো পরশুদিন কথা বললাম!'

স্বামীনাথবাবু সেদিন অফিস থেকে আসতেই সোনাদি বললে, 'ঠাকুর-ঝি কি বলছিল জানো, তোমার সঙ্গে নাকি আমার ঝগড়া হয়েছে, কথা না বললেই যেন ঝগড়া হতে হবে—'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'ওদের কথায় কান দিয়ো না।'

'কিন্তু তুমিই বলো না, তুমি কি এতে রাগ করো?'

স্বামীনাথবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাকে দেখে বুঝতে পারো না, আমি রাগ করি কিনা?'

সোনাদি বললে, 'তুমি ওদের সকলকে তাহলে বলে দিয়ো যে তুমি এতে রাগ করো না—ওরা কেন বোঝে না, ওদের বোঝাতে পারো না যে তোমার এতে অমত নেই ?'

'আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলবো ওদের, কিন্তু ওরা কি বুঝবে ?'

সেইদিন থেকে জব্বলপুরের একটি সংসারে স্বামী-স্ত্রীর এক অদ্ভুত দাম্পত্য-জীবন সুরু হল। সোনাদি স্বামীনাথবাবুর স্ত্রী! তবু এক শয্যায় শয়ন না করলেও কিছু আসে যায় না ওদের। স্বামীনাথবাবুর সঙ্গে যেদিন দেখা হয়, বলে, 'তোমাকে যেন বড় রোগা দেখাচ্ছে আজ—'

স্বামীনাথবাবু সংক্ষেপে বলেন, 'অফিসে বড় খাটুনি পড়েছে কিনা আজকাল।'

'অত না-ই বা খাটলে ?'

'না খাটলে কি চলে ?'

'রাত্রে ঘুম হয় ভালো ?'

'ঘুমের ব্যাঘাত হবার তো কোনও কারণ নেই, একবার শুলে কখন যে আমার রাত পুইয়ে যায় টেরও পাইনে।'

'তাহলে খাওয়া-দাওয়া ভালো করে করো, দুধটা তোমার আরো বেশি করে খাওয়া উচিত।'

'দুধ তো খাই।'

'তবে কিছুদিন ছুটি নিয়ে কোথাও চেঞ্জে যাও দিনকতক।'

'আর তুমি ?'

'তুমি যদি বলো আমিও সঙ্গে যেতে পারি।'

'আমি না বললে যাবে না সঙ্গে ?'

'সেকি, আমার তো যাওয়াই উচিত, কিন্তু যদি না-ই যাই তো একলা যেয়ো না তা ব'লে। তাহলে অফিস থেকে একজন চাপরাসী সঙ্গে নিয়ো বরং, তোমার দেখাশোনা করবে।'

একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলো সোনাদি। নেপিয়ার টাউনে দাশসাহেবের বাড়িতে গীতাপাঠ হচ্ছিল। ভাষ্যকার কথা-প্রসঙ্গে বলছিলেন,

'জীব কী অনু, না বিভু ? জীব কি ব্রহ্মের অংশ, না ছায়া ? জীব কী ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, না অভিন্ন ? আমাদের দর্শনশাস্ত্রের এ এক মূল সমস্যা, মৈনাককে যদি লেখনী করি আর সমুদ্র-জলকে মসিরূপে ব্যবহার করি তবু এর মীমাংসা হয় না—

ব্রহ্মসূত্র বলছেন—অংশো নানাব্যপদেশাৎ...

অথচ গীতা বলছেন,—অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্...

আবার উপনিষদ বলছেন,—একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রয়েছেন। জলে চন্দ্রের ছায়ায় মতো একই তিনি বহুরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন···।'

ননদরাও শুনছিল। এক সময়ে বললে, 'চলো বৌদি, সংস্কৃতের কিছু মাথামুণ্ডু বুঝছিনে, বাড়ি গিয়ে বরং ঘুমোলে কাজ হবে।' কিন্তু সোনাদির খুব ভালো লাগছিল ! বললে, 'আর একটু শোনো না ঠাকুর-ঝি, বড় ভালো লাগছে।' সোনাদির মনে হচ্ছিল যেন সে বাবার কাছে বসে গীতার ব্যাখ্যা শুনছে। এমনি করে বাবার কথা শুনতে শুনতে কতদিন বিভোর হয়ে গেছে ! কতদিন সংসার, সমাজ, খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেছে বাবার পড়া শুনতে শুনতে।

ননদরা বললে, 'তবে তুমি থাকো বৌদি, আমরা আসি—'

কখন ননদরা চলে গেছে। সভার সব লোক চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত বুঝি দাশসাহেব একলা বসে ছিলেন। তা দাশসাহেব নিজের গাড়ি করেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। বাড়িতে এসে যখন পৌঁছুলো সোনাদি, তখন রাত প্রায় বারোটা। সমস্ত আবহাওয়া নিঝুম। বাগানের গেট খুলে যখন ঢুকলো তখনও সোনাদির খেয়াল নেই রাত ক'টা বেজেছে।

দরজা খুলে দিয়ে ননদ বললে, 'হ্যাঁ, বৌদি, এত রাত্তির করতে হয় ?'

'রাত ক'টা ?'

'দেখো না ঘড়ির দিকে চেয়ে—'

স্বামীনাথবাবু ঘুম থেকে জেগে বললেন, 'ঠাণ্ডা লাগেনি তো তোমার ?'

সোনাদি বললে, 'না।'

পুঁটুর তখন এক বছর বয়েস। সোনাদি বললে, 'পুঁটু তাহলে তোমার কাছেই থাক্।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'থাক্ না আমার কাছেই, তুমি শুয়ে পড়োগে যাও—'

দাশসাহেবের বাড়িতে আজ গীতাপাঠ, কাল কথকতা, পরশু রামায়ণ পাঠ। দাশসাহেব অবশ্য ও-সব ধর্ম-কর্মের ধার ধারেন না। দাশসাহেবের স্ত্রীর অনুরোধেই এই সব অনুষ্ঠান হত। কিন্তু সেই স্ত্রী-ই একদিন মারা গেল হঠাৎ দু'টি ছেলে-মেয়ে রেখে সংসারকে একেবারে অনাথ করে দিয়ে। সেই অনাথ সংসারের হাল ধরতে এল সোনাদি।

রতি বলে, 'আজ তোমার কাছে শোব মা আমি।'

শিশু বলে, 'আমাকে বেড়াতে নিয়ে চলো না মা তোমার সঙ্গে।'

প্রথম প্রথম পালিয়েই আসতো সোনাদি। রতি আর শিশু দেখতে না পায়। অভিলাষ তখন থেকেই ছিল। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সে-ই আড়ালে নিয়ে যেত। দাশসাহেবের গাড়ি নিঃশব্দে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিত সোনাদিকে।

দাশসাহেব বলতেন, 'তোমার তো দেখছি ভারি অসুবিধে হল।'

'না, অসুবিধে আর কী?'

'কিন্তু তোমাকে 'মা' বলে ডাকতে শেখালে ওদের কে?'

'ছেলে-মেয়েদের মা বলতে শেখাতে হয় না—আমি তিনজনেরই মা যে—'

'কিন্তু রাত্তির বেলা তোমাকে যে এখানে থাকতে বলে ওরা, স্বামীনাথবাবু কী ভাবছেন কে জানে—'

'ওঁকে তাহলে তুমি খুব চিনেছ।'

'এই যে এ-বাড়িতে এতক্ষণ কাটাও, উনি কিছু বলেন না?'

'বাড়িতে থাকলেই কি আমার সঙ্গে চব্বিশ প্রহর দেখা হয়?'

সেদিন স্বামীনাথবাবু বললেন, 'কদিন তোমাকে দেখিনি মনে হচ্ছে?'

সোনাদি বললে, 'আমি তো বাড়িতে তিন দিন আসতেই পারিনি।'

'ও'।

তবু স্বামীনাথবাবু জিগ্যেস করলেন না, এ-তিনদিন কোথায় ছিল সোনাদি। কী এমন রাজকার্য!

সোনাদি নিজেই বললে, 'রতির বড় অসুখ করেছিল জানো?'

স্বামীনাথবাবু শুধু জিগ্যেস করলেন, 'এখন কেমন আছে?'

খানিক পরে স্বামীনাথবাবু বললেন, 'এমাসে প্রিমিয়ামের টাকাটা এখনও পাঠানো হয়নি, চিঠি এসেছে একটা।'

সোনাদি বললে, 'আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি আজকে কী খাবো?'

'তোমার শরীর খারাপ নাকি?'

'মাথাটা ধরেছে সকাল থেকে, ছাড়ছে না মোটে।'

ওদিকে দাশসাহেবের লোকও চিঠি নিয়ে আসে: 'রতি তোমাকে দেখবার জন্যে বায়না ধরেছে বড়, একবার এলে আমি অফিস যেতে পারি—'

সংসারের সম্বন্ধে কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তখনি সোনাদি চলে আসে দাশসাহেবের বাড়িতে।

দাশসাহেব বলেন, 'আজ আমার অফিস যাওয়াই হল না।'

'এখন তো আমি এসে গেছি, এখন যাও।'

'এত দেরি করে আর যাবো না—'

'অফিস কামাই কোরো না মিছিমিছি, যাও গাড়ি বার করতে বলছি আমি।'

'না-ই বা গেলাম।'

'না, তোমায় অফিস যেতেই হবে।'

এমনি করে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠলো জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনের দু'টো বাড়ির সঙ্গে। সাতদিন দাশসাহেবের বাড়িতে কাটলেও স্বামীনাথবাবুর কোনও অস্বস্তি হবার কথা নয়। সোনাদি স্বামীনাথবাবুরই স্ত্রী, তা সে নিজের বাড়িতেই থাকুক আর পৃথিবীর যেখানেই থাকুক। আর দাশসাহেব? কাছে পেলেই কি সম্পূর্ণ পাওয়া হয়! এক ছাদের তলাতে থাকলেই কি একাত্ম হওয়া যায়? সোনাদি দূরে গেলেও যেন

কাছে থাকে, কাছে রেখেও যেন দুর্লভ মনে হয় সোনাদিকে। সত্যিই তো অখণ্ডকে যে জানতে পেরেছে, খণ্ড দেখে তো ভয় পাবার কথা নয় তার।

সোনাদি বলতো, 'উর্বশীর মতো একটা চরিত্র আঁকবার চেষ্টা কর তো দেখি, যে কারোও মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়—কিছু নয়! বিক্রমোর্বশী পড়েছিস? পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর সেই সম্পর্ক—মনে আছে?'

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায় পড়েছিলাম: 'উর্বশী কল্পনার সঙ্গিনী মানসের রঙ্গিণী, কবিরা যাকে রস বলেন সেই রসের খর-প্রস্রবণ।' মনে হত সোনাদি যেন নিজের কথাই বলতে চাইছে। আমি যাদের দেখেছি, যাদের কথা লিখেছি—সব যেন সাধারণ মেয়ে সব। ওই সুধা সেন, অলকা পাল, মিষ্টিদিদি, মিছরি বৌদি, মিলি মল্লিক—সবাই তুচ্ছ। সোনাদি আমার একটা গল্পও তাই ভালো বলেনি কোনদিন। কিছু পছন্দ হয়নি সোনাদির কখনো। বলতো, 'বৃহতের দিকে নজর রাখ্, দৃষ্টি রাখ্ ভূমার, দিকে, দৃষ্টি রাখ্ মহাভারতের দিকে। উপন্যাস যদি লিখতেই হয় তো মহাউপন্যাস লিখবি—অখণ্ড যার পরমায়ু। নইলে বছরে দু'টো করে বই লিখবি আর বছর না কাটতেই সব ভুলে যাবে লোকে, তবে আর কিসের জীবন-শিল্পী!'

আমিও ভাবতাম—এত চরিত্র দেখেছি বলে আমার মিথ্যেই গর্ব। সত্যিই যে উর্বশীকে দেখতে পেয়েছে তার কাছে সব নারী-চরিত্র তো ম্লান।

তাই মিছরি-বৌদির গল্পটা লিখবো-লিখবো করেও আর লিখিনি! অথচ মিছরি-বৌদিকেই একদিন মনে হত কত বিচিত্র চরিত্র! অমরেশের বউ—সেই মিছরি-বৌদি।

মিষ্টিদিদির গল্প তো আপনারা শুনেছেন। এবার আর-একজনের গল্প বলি—সে আমার মিছরি-বৌদির গল্প। মিছরি-বৌদি কিন্তু আমার সাত কুলের কেউ নয়। আপন বৌদি তো দূরের কথা, দূর সম্পর্কেরও বৌদি নয়। মোট কথা মিছরি-বৌদিকে আমি জীবনে দু'বারের বেশি দেখিওনি। তবুও মিষ্টিদিদির কথায় মিছরিবৌদির কথা আমার প্রায়ই মনে পড়তো। কোথায় যেন মিষ্টিদিদির সঙ্গে মিছরি-বৌদির একটা মিলও ছিল। হয়ত

সে-মিল তাদের চেহারায়। মিষ্টিদিদির মত মিছরি-বৌদিও ছিল পাতলা ছিপছিপে রোগা। মনে হত ফুঁ দিলে উড়ে যাবে বুঝি। মনে হত দু'পা হাঁটলেই বুঝি হার্ট-ফেল্ করবে। মনে হত—আর ক'দিনই-বা বাঁচবে.... একদিন একটু জ্বর হলেই মিছরি-বৌদি মারা যাবে হঠাৎ!

অন্তত অমরেশ মিছরি-বৌদিকে নিয়ে যা করতো—আমার তো রীতিমতো ভয় হয়েছিল!

অমরেশ ছিল গুণ্ডা চেহারার মানুষ। বলতো, 'এই দেখ, মিছরিকে নিয়ে কেমন লোফালুফি খেলি। এই দেখ—এক—দুই—তিন—'

আমার অন্তরাত্মা তখন শুকিয়ে গেছে। মিছরি-বৌদিও কম ভয় পায়নি। মিছরি-বৌদিকে টপ্ করে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে লোফালুফি সুরু করে দিত অমরেশ। একটু যদি হাত ফস্কে যায় তো, মিছরিবৌদির ওই শুকনো হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না তাহলে।

বলতাম, 'থাম্—থাম্—করিস কি অমরেশ! থাম্।'

মিছরি-বৌদিও তখন বেশ ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

কাপড়চোপড় নিয়ে ব্যস্ত। মাথার ঘোমটা খসে গেছে। খোঁপা খুলে গেছে। অমরেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচে যেন।

বললে, 'দেখলেন তো ঠাকুরপো—দিনরাত এই রকম! যদি পড়ে যেতুম—'

অমরেশ তখন হাতের মাস্ল্ দুটো ফোলাচ্ছে।

বললে, পড়তেই যদি যাবে তো, চেহারাটা বাগিয়েছিলাম কেন? এতদিন মাখম, ডিম, ছোলা খেয়েছি কি শুধু মিছিমিছি?'

তাই এই মিছরি-বৌদিকেই বহুদিন পরে একদিন দেখলাম জব্বলপুর স্টেশনে।

জব্বলপুর স্টেশনে বম্বে মেল থেকে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠবো। তাড়াতাড়ি করছি। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে বললে, 'ঠাকুরপো না?'

ফিরে চাইলাম। কিন্তু সামনে যাকে দেখলাম তাকে আমার চিনতে পারার কথা নয়। বেশ মোটাসোটা মেয়ে। মাথায় আধঘোমটা। হাতে

একটা এম্‌ব্রয়ডারি-করা ব্যাগ। ফরসা, মাজাঘষা রঙ। আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আমার মুখ-চোখের ভঙ্গী দেখে বললে, 'এরি মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি মিছরি-বৌদিকে ?'

মিছরি-বৌদি !

আমি সবিস্ময়ে আর একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আমার চেনা মিছরি-বৌদির সঙ্গে এ চেহারার মিল নেই কোনখানে। কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেলাম। এমন তো হবার কথা নয়। এমন পরিবর্তন তো হয় না মানুষের।

মিছরি-বৌদি তখন হাসছিলো। বললে, 'আমার বাড়িতে চলুন আজকে আর কোথাও যেতে পাবেন না।'

মিছরি-বৌদি কাদের বুঝি ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলে।

বললাম, 'আমার যে জরুরী কাজ ছিল একটা।'

'তা থাকুক কাজ'—ব'লে আমাকে টেনে নিয়ে চললো।

আমি কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছি। অমরেশ অবশ্য চিকিৎসা করাতো মিছরি-বৌদির। দেখেছিলাম মিছরি-বৌদির টেবিলে অনেক রকম ওষুধের শিশি। অনেক রকম লিভার এক্‌সট্রাক্ট।

অমরেশ বলতো, 'মনটা খুশি রাখতে পারলেই মিছরির শরীরটা চড় চড় করে সেরে উঠবে।'

তা মিছরি-বৌদির মন প্রফুল্ল রাখবারই কি অমরেশ কম চেষ্টা করেছে ! বাগানে দোলনা টাঙিয়ে দিয়েছে। সে দোলনাও আমি দেখেছি। কিন্তু অমরেশের তো কাণ্ড। দোল দিতে দিতে অমরেশ এমন জোরে দোল দিত যে, মিছরি-বৌদির বুক তখন কাঁপছে থরথর করে। নামতে পারলে বাঁচে।

মিছরি-বৌদি বলেছিল, 'দেখছেন তো ঠাকুরপো, আপনি না থাকলে আমি আজ মরেই যেতাম।

আমি সেবার বলে এসেছিলাম, 'খুব সাবধানে থাকবেন বৌদি—অমরেশ সব পারে !'

অমরেশকে আমি চিনতাম ছোটবেলা থেকে। মিত্র ইনষ্টিটিউশন্ থেকে এক ক্লাসে পড়ে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম দুজনে। অমরেশকে চিনতে আমাদের আর বাকি নেই। কতদিন কতবার অমরেশের কত ঘুষি, কত কিল খেয়েছি তার আর হিসেব-পত্তোর নেই। অথচ আদর করেই করতো সে-সব। অমরেশের আদরের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ছোটবেলায়।

হঠাৎ হয়ত আদর করেই পিঠে একটা ঘুষি মেরে বললে, 'কিরে, কোথায় যাচ্ছিস ?'

কিংবা হয়ত হাসির গল্প করতে করতে খুব ফুর্তি হয়েছে অমরেশের, হঠাৎ ফুর্তির আবেগে দুদিকে দুজনের পিঠে দুই কিল মেরে হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললো, 'আর হাসাস্ নে ভাই, দম ফেটে যাবে এবার।'

অমরেশের পক্ষে যা ছিল খেলা, আমাদের পক্ষে তা-ই ছিল মৃত্যু-যন্ত্রণা। আমরা তখন হয়ত কিল খেয়ে আর শিরদাঁড়া সোজা করতে পারছি না। যন্ত্রণায় পিঠ কন্‌কন্ করছে !

অমরেশ বলতো, 'আমার মতো ছোলা খা, দুধ খা, ডিম খা, মুগুর ভাঁজ্—তোদেরও আমার মতো চেহারা হবে ! ও রকম দশটা কিলেও কিছু হবে না।'

অমরেশের ঘরে গিয়ে দেখেছি—চারিদিকে কেবল স্যাণ্ডো, হারকিউলিস, এ্যাপোলোর ছবি। নানারকমের চার্ট। শরীর সারাবার কৌশল লেখা সব বই। বারবেল, মুগুর, ডাম্বেল—এই সব ! যত রকমের কলা-কৌশল আছে, সব শিখে নিত অমরেশ। ভারী ভারী লোহার বল ছুঁড়তো। দেড় মণ দু' মণ ওজনের বারবেল অনায়াসে তুলতো মাথার ওপর।

বলতো, 'জানিস, কাল হঠাৎ স্যাণ্ডোকে স্বপ্ন দেখেছি।'

বললাম, 'স্যাণ্ডো !'

হ্যাঁরে, দেখলুম স্যাণ্ডো যেন আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আমি স্যাণ্ডোকে দেখেই বাইসেপস্ দু'টো ফুলিয়ে দিলুম। স্যাণ্ডো বললে, 'সাবাস্ বেটা, জীতা রহো।'

আমাদের কুস্তির আখড়াতে একলা অমরেশই শুধু শেষ পর্যন্ত টি ঁকে ছিল। চাঁদা করে কুস্তির আখড়া করেছিলুম সোনাদির বাগানের এক কোণে। নিমপাতা দিয়ে আখড়ার মাটি মেখেছিলুম। ভোরবেলা উঠে গিয়ে আখড়ার মাটিতে গড়াগড়ি দিতুম। প্যারালাল বার, হোরাইজেণ্টাল বার, রিং—সব রকমের ব্যবস্থাই ছিল। তারপর বাড়িতে এসে কল্-বেরোন ছোলা আর আদা-নুন খেয়ে স্নান করে ফেলতুম। সে-সব কতদিন আগেকার কথা! আমরা অমরেশের মতো চেহারা করবার চেষ্টা করতুম। অমরেশ ছিল আমাদের পাণ্ডা। অমরেশের উৎসাহেই আমাদের উৎসাহ, অমরেশই আমাদের আদর্শ! মাসে একদিন হনুমানজির পুজো হতো। আখড়ার এক কোণে হনুমানজির মূর্তি তৈরি করেছিল আমাদের আর্টিস্ট জয়ন্ত। সেদিনটা আমাদের উৎসব। সকাল থেকে সিঁদুর মাখানো হচ্ছে হনুমানজির গায়ে। চাঁদার পয়সায় ছোলা হওয়া হত, মাখন আসতো, মর্তমান কলা আসতো। অমরেশ বলতো, 'খুব করে ভিটামিন খাবি, তাতে শরীরের জোর হয়।'

মনে আছে ভিটামিন কথাটা অমরেশের মুখেই প্রথম শুনি। সেই ভিটামিন খেয়ে কিনা জানি না, অমরেশের চেহারা দিন দিন দৈত্যের মত হয়ে উঠলো। আমরা যে-যার দিকে ছিট্‌কে পড়লাম। কেউ চাকরিতে, কেউ ব্যবসায়, কেউ বা দালালিতে। ভুলে গেলাম আখড়ার কথা।

কিন্তু অমরেশ স্বাস্থ্যচর্চা ছাড়লে না। ক্লাবের বারবেল, ডাম্বেল, মুগুর সব কিছু নিয়ে একদিন ছাদের ওপর তুললো, বললে, 'ওটা কি ছাড়তে পারি রে—তাতে যে বাত হবে।'

বললে, 'তোরাও ছাড়িস্‌নি। এখন ছেড়ে দিলে বাতে পঙ্গু হয়ে যাবি সব।'

মনে আছে আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা ইনসিওরের দালালি করতো। একবার এসেছিল কিছু কেস্ যোগাড় করে নিতে। বললে, 'তোর বন্ধু-বান্ধবরা তো চাকরি-বাকরি করছে এখন, দে না দু'একটা কেস্ করিয়ে।' দু' একটা পলিসি করিয়েও দিয়েছিলাম। কেউ বা স্বার্থের তাগিদে করেছিল,

কেউ বা উপরোধে পড়ে। কিন্তু অমরেশের কাছে কথাটা পাড়তেই রেগে গেল।

বললে, 'ইনসিওর করবো কেন?'

দাদা বুঝিয়ে বলতে গেল, 'এই তো জীবন আমাদের! কখন আছি, কখন নেই....আপনার অবর্তমানে....'

কথাটা শেষ হল না। অমরেশ বললে, 'মরবো কি মশাই, মরে ওমনি গেলেই হল।'

বলে গেঞ্জিটা খপ্ করে খুলে ফেলে আবার বললে, 'স্বাস্থ্যটা দেখেছেন? অনেক বারবেল, মুগুর ভেঁজে গড়েছি চেহারাটা।'

তারপর গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বললে, 'অত সহজে মরছি না আমি মশাই।'

তা সেই অমরেশ শেষকালে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল হঠাৎ। আর তার খবর পাইনি। পরে শুনলাম, সে নাকি মোরাদাবাদের এক পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে গেছে। তারপর আরো কয়েক বছর পরে যখন আমি বাইরে চাকরি করছি, তখন একবার কলকাতায় এসে শুনলাম —বক্সিং-এ ট্রফি জিতেছে অমরেশ সেবার। এমনি করে কয়েক বছর পর পর একটু একটু সংবাদ পাই অমরেশের! কখনও খবরের কাগজে খেলা-ধুলোর পাতায় ছবি বেরোয়, কখনও শুনি, সে লক্ষ্ণৌতে ড্রিল-মাস্টারি করছে কোন সরকারী ইস্কুলে। আবার কখনও শুনি, বোম্বেতে মিউনিসিপ্যালিটির চাকরি নিয়ে গেছে ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টার হয়ে। এই রকম ছাড়া-ছাড়া খবর সব। কিন্তু মনে মনে বরাবর একটা শ্রদ্ধা ছিল অমরেশের ওপর। একমাত্র আমাদের মধ্যে ও-ই কেবল স্বাস্থ্যচর্চা নিয়ে রইল। মনে হত বাঙালীর বদনাম ঘোচাতে পারবে বটে অমরেশ!

তারপর যেবার জব্বলপুরে গেলাম আপিসের কাজে, সেইবার হঠাৎ রাস্তায় অমরেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নেপিয়ার টাউনে লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে আছি। গেট বন্ধ। ট্রেন আসছিল।

হঠাৎ পিঠের ওপর এক ভীষণ মর্মান্তিক ঘুষি!

মনে হল পিঠটা যেন আর নেই আমার! সমস্ত চোখে তখন আমি সরষের ফুল দেখছি। কোন রকমে চোখের জল সামলে সামনে চেয়ে দেখি, হো হো করে বিকট হাসি হাসছে আর কেউ নয়, আমাদের অমরেশ! এক হাতে সাইকেলটা ধরা।

বললে, 'তুই এখানে ?'

আমারও ও-ই ছিল প্রশ্ন! প্রশ্ন না করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অমরেশের দিকে চেয়ে রইলাম শুধু। অমরেশ এক হাত দিয়ে আমার কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে বললে, 'তুই এখানে কেন রে ?'

আমিও বললাম, 'তুই ?'

কিন্তু এবার সরে এলাম। কাছে থাকলেই, গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা অমরেশের স্বভাব।

গেট্ তখন খুলে দিয়েছে। একটা ট্রেন ডানদিকে থেকে বাঁদিকে চলে গেল। অনেকগুলো গরুর গাড়ি, সাইকেল-রিক্‌শা, ঘোড়ার গাড়ি আটকে ছিল এতক্ষণ। তারাও চলতে লাগলো।

অমরেশ বললে, 'আমার বাঙলোয় চল্।'

বললাম, 'তুই এখানে কেন ? কবে থেকে ?'

অমরেশ বললে, 'সে-সব কথা পরে হবে, তুই আমার সাইকেলের পেছনে ওঠ্।'

বললাম, 'কতদূর ?'

'বেশি না, মাইল ছয়েক।'

ছ'মাইল সাইকেলের পেছনে চড়াও যেমন বিপদ, আমার মতো ভার নিয়ে এতখানি চালানোও শক্ত। বললাম, 'না, থাক। তোর কষ্ট হবে।'

'কষ্ট! তোকে কাঁধে করে দশ মাইল নিয়ে যেতে পারি জানিস্, মুগুর ভাঁজি কি মিছিমিছি নাকি ?'

তারপর বললে, 'তুই আমায় লজ্জা দিলি সত্যি।'

বললাম, 'এখনও মুগুর ভাঁজিস্ তুই ?'

যাহোক, সেদিন শেষ পর্যন্ত সাইকেল-রিক্‌শাতে চড়ে অমরেশের বাঙলোয় গিয়েছিলাম। নেপিয়ার টাউন থেকে গান্‌-ক্যারেজ ফ্যাক্টরি। রাস্তা অনেকখানি। মাঝে অনেক চড়াই উতরাই। কিন্তু সারা রাস্তা অমরেশ আমার পাশে পাশে গল্প করতে করতে চলেছিল।

বলেছিল, 'জব্বলপুরে এলি, আর আমার বাঙলোয় উঠবি না—শুনলে মিছরি রাগ করবে যে।'

বুঝেছিলাম, মিছরি অমরেশের বউ-এর নাম। মিছরির কথা বলতেই অমরেশ পঞ্চমুখ। মিছরি বড় রোগা। মিছরি যা খায় হজম হয় না। মিছরির শরীরের ওজন। এই সব।

বললে, 'গ্যাখ্‌ আজ পর্যন্ত কত ছেলেকে মানুষ করলুম, কত হাড়জির-জিরেকে মাস্‌ল্‌ ফুলিয়ে দিলুম ; কত ছেলে আগে ভাত হজম করতে পারতো না, তাদের দিয়ে লোহা হজম করিয়ে দিলুম তার গোনাগুনতি নেই। কিন্তু মিছরিকে পারছি না। কেবল আজ অম্বল, কাল চোঁয়াঢেকুর।'

বললাম, 'ডাক্তারে কী বলে ?'

তারপর অমরেশ আরো অনেক কথা বলেছিল। বলেছিল, 'তা ছাড়া ও-মেয়েকে বিয়ে না করলে অমন চাকরিটা প্রায় তখন হাত-ছাড়াই হয়ে যায়—শ্বশুর নিজে হল তখন ওয়ার্কস্‌ ম্যানেজার—'

অমরেশ রাস্তায় যেতে যেতে অনেক গল্প করেছিল সেদিন। কিন্তু অমরেশের কথা শুনে আমার যেন সেদিন খুব আনন্দ হয়েছিল মনে মনে। রোগা চেহারার ওপর অমরেশের বরাবর রাগ ছিল। আশেপাশে ক্ষীণ-স্বাস্থ্য লোক দেখতে পারতো না মোটে। দুর্বল লোক দেখলে কিল-ঘুষি আবার বেশি চালাতো। দুম্‌ দুম্‌ করে ঘুষি মারতো তার বুকের পাঁজরার ওপরে। বুক ফুলিয়ে বলতো, 'স্বাস্থ্য হবে এই এইরকম, এই গ্যাখ'—বলে নিজের বুকটা ফুলিয়ে ডাব্‌ল্‌ করতো অমরেশ।

সেই অমরেশ এবার সত্যিই জব্দ হয়েছে ভেবে খুব আনন্দ পেলাম। মিছরিকে নিশ্চয়ই ঘুষি মারতে পারবে না। মিছরির জন্যেই তার চাকরি। শুধু চাকরি নয়, ভালো চাকরি। নইলে বাঙলো পায়!

কিন্তু অমরেশের বাঙলোয় গিয়ে সে-ভুল আমার ভাঙলো।

বাঙলোর সামনে সাইকেল থেকে নেমেই কিন্তু অমরেশ চীৎকার জুড়ে দিলে, 'মিছরি, মিছরি—'

চাকর-বাকড় দৌড়ে এল অমরেশের সাড়া পেয়ে, কিন্তু যাকে ডাকা সে কিন্তু এল না।

একজন চাকরকে অমরেশ জিগ্যেস করলে, 'মেম-সাহেব কোথায় ?'

সে বললে, 'বিছানায় শুয়ে আছে।'

আমাকে ঘরে বসিয়ে অমরেশ দৌড়ে ভেতরে গেল। বললে, 'তুই বোস্। আমি মিছরিকে ডেকে আনি।'

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম। সাহেবী কেতায় সাজানো ঘর, এক-পাশে দেয়ালের গায়ে ম্যাণ্টেলপিসও রয়েছে। তার নিচে আগুন জ্বালাবার জায়গা। ওপরে অমরেশের নানা বয়সের ফোটোগ্রাফ। কোনোটা খালি গায়ে। শরীরের নানা অংশের মাস্ল্ দেখাচ্ছে অমরেশ। অনেক মেডেল ঝোলানো গলায়। সার্টিফিকেটগুলো ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছে। আর দেয়ালের চারিদিকে বড় বড় পালোয়ান, কুস্তিগীরদের ছবি। অমরেশের সব দেবতামণ্ডলী।

খানিক পরে যেন মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পেলাম, 'ওমা, করো কী—ছি ছি, করো কী…'

দেখি, অমরেশ বউকে একেবারে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে হাজির।

বললে, 'দেখলি, এই হল মিছরি।—আর, ও হল…'

আমি যতটা না অপ্রস্তুত হলাম, মিছরি-বৌদি আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। তাকে পাঁজাকোলো করে নিয়ে অমরেশ ঘরের ভেতর ঘুরতে লাগলো।

মিছরি-বৌদি বললে, 'কী লজ্জা বলো তো! ছাড়ো।'

কিন্তু মনে আছে, অমরেশ সেদিন, সেই প্রথম দিন, কী কাণ্ডই যে করেছিল!

বললে, 'এই গ্যাখ্ মিছরিকে লুফবো দেখবি।'

কিন্তু আমি ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই অমরেশ মিছরি-বৌদিকে সত্যি সত্যি লুফতে আরম্ভ করেছে।

বললে, 'এই ছ্যাখ্—এক, দুই, তিন…'

আমি আর দেখতে পারলুম না। আমার বুকটা তখন ধড়াস ধড়াস করছে!

মিছরি-বৌদিও তখন অনুনয় বিনয় করে বলছে, 'ছাড়ো, ছাড়ো, পড়ে যাবো যে! ছি ছি, কী তুমি!'

মিছরি-বৌদির মাথার খোঁপা তখন খসে গেছে! শাড়ি অবিন্যস্ত। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই অমরেশের। সে তখন গুনছে, 'তিন, চার পাঁচ,….'

আমি আর পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ছাড় না অমরেশ, ওকি—ছাড়—'

প্রথম দিনেই অমরেশ এমন কাণ্ড করবে ভাবতে পারিনি আমি। তাহলে আসতামই না এখানে। দেখলাম, অমরেশ এতদিন পরেও এতটুকু বদলায়নি। গুণ্ডামির ভাবটা তার চরিত্র থেকে এখনও যায়নি। নিজের স্ত্রীর ওপরেও সে তেমনি নিষ্ঠুর!

মিছরি-বৌদি তখন হাঁফাচ্ছে। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। নামিয়ে দেবার অনেকক্ষণ পরেও সেদিন মুখে কথা বেরোয়নি মিছরি-বৌদির। চেয়ারে বসে পাখার তলায় অনেকক্ষণ জিরিয়ে তবে মুখে কথা ফুটলো।

বললে, 'দেখলেন তো ঠাকুরপো, আপনি না থাকলে আমি আজ মরেই যেতাম!'

মিছরি-বৌদিকে এবার ভালো করে দেখলাম। কাটির মতো পাতলা শরীর, গলায় কণ্ঠা বেরোন। গালের চোয়াল দু'টোও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, তীক্ষ্ণ। কোথাও কোনো চর্বি যেন নেই শরীরে।

অমরেশ বলেছিল, 'দেখলি তো ভাই, এই রকম সারাদিন—খালি বিছানায় শুয়ে থাকবে।'

খেতে বসে দেখলাম মিছরি-বৌদি খাবারগুলো টেবিলের নিচে একটা

বাটিতে লুকিয়ে ফেলেছে। অমরেশ মিছরি-বৌদির উল্টো দিকে বসেছিল। খাওয়া দেখছিলাম আমি অমরেশের। এক প্লেট ভাত, চার বাটি মাংস, এক ডিস্ ফল, তারপর প্রায় দু'সের দুধ আর একুনে তিরিশখানি রুটি। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আর এক-একবার মুখ তুলে আমাকে বলছে, 'খা খা। ফেলে রাখিস্নে, সব খেতে হবে।'

তারপর মিছরি-বৌদিকে লক্ষ্য করে বললে, 'ক'টা রুটি খেলে তুমি?'

মিছরি-বৌদি অক্লেশে বললে, 'এই তো বারোখানা হচ্ছে।'

'আর মাংস?'

মিছরি-বৌদি অম্লান বদনে বললে, 'তিন বাটি।'

অমরেশ বললে, 'আর চারখানা রুটি খেলে তবে তোমার ছুটি।'

মিছরি-বৌদি কিছু বললে না। কিন্তু দেখলাম খুব সন্তর্পণে মাংস, রুটি, তরকারি, ফল—সমস্ত টেবিলের নিচে একটা পাত্রে লুকিয়ে ফেলেছে।

পরে আমাকে মিছরি-বৌদি বলেছিল, 'ওঁকে যেন বলবেন না, তাহলে আমায় একেবারে খুন করে ফেলবেন। ষোলখানা রুটি খেয়ে কি মরবো নাকি পেট ফুলে, ঠাকুরপো!'

'ক'খানা খেলেন সত্যি সত্যি?'

'মাত্র দু'খানা। দু'খানা খেলেই আমার পেট ভরে যায়।'

খেতে খেতে অমরেশ বলেছিল, 'খাবে, দৌড়বে, লাফাবে-ঝাঁপাবে, হৈ হৈ করবে—তবে না লাইফ্। আর তা না হলে কুড়ি বছরেই বুড়িয়ে গিয়ে একদিন রক্ত-আমাশা হয়ে টুপ করে মরে যাও—বাঙালীর তো ওই এক পরিণতি।'

মিছরি-বৌদি পরে বলেছিল, 'এ আর কী দেখছেন ঠাকুরপো, আপনি এসেছেন তাই, নইলে দুপুরবেলা যেদিন বাড়ি থাকেন, সেদিন হঠাৎ যদি খেয়াল হয়, তো স্কিপিং করতে হবে ওঁর সঙ্গে···সে আর শেষ হতে চায় না, পা হাত কন্কন্ করলেও রেহাই নেই, শেষকালে একেবারে আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়—'

বলতে বলতে মিছরি-বৌদির যেন ভয়ে মুখ শুকিয়ে এল।

আর ওই দেখুন দোল্‌না, বিকেলবেলা এসেই দোল্‌না চাপতে হবে—ওতে নাকি পায়ের আর বুকের জোর বাড়ে, আবার মাঝখানে একবার ঘোড়া কিনেছিলেন একটা, বললেন—রাইডিংটা সবচেয়ে নাকি ভালো একসারসাইজ।'

'সে ঘোড়া কোথায় গেল ?'

'সে মরে গেল তাই, কিন্তু ক'দিন যে সে কী গায়ে ব্যথা—ঘুমোতে পারি না, শুতে পারি না, দাঁড়াতে পারি না, বসতে পারি না—সে যে কী অশান্তি! শেষে ঘোড়াটার বোধ হয় মায়া হল আমার ওপর, মরে গেল একদিন দয়া করে।'

অমরেশের ব্যাপারটা আমার বরাবরই কেমন যেন একটা ব্যাধি বলে মনে হত। সব শুনে সেদিনও মনে হয়েছিল ব্যাধিটা যেন বেড়েছে বৈ কমেনি। আর একটা দিন মাত্র ছিলাম জব্বলপুরে, কিন্তু সেই একদিনেই মিছরি-বৌদির জন্যে আমার সত্যিই মায়া হল। এমন স্বামীর হাতে পড়ে মিছরি-বৌদি নিশ্চয় একদিন মারা যাবে মনে হল। ওই শরীর নিয়ে যে কী করে বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য মনে হয়েছিল সেদিন। ওই স্বাস্থ্য-উদ্ধারের নামে অত্যাচার—এ অমরেশের আর একরকম চরিত্র-বিকৃতি! ওর চিকিৎসা, সাধারণ চিকিৎসা নয়। রোগটা মানসিক। মনের নিভৃতে কোথায় যেন পোকা ধরেছে অমরেশের।

আসবার দিন মিছরি-বৌদিকে কথা দিয়েছিলাম, 'এদিকে এলে নিশ্চয় উঠবো আপনার এখানে।'

মিছরি-বৌদি বলেছিল, 'এলে আমাকে আর দেখতে পাবেন না ঠাকুরপো, তবে আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে ঠিকই।'

মিছরি-বৌদি অবশ্য হাসতে হাসতেই কথাটা বলেছিল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম তার মনের গোপন ব্যথাটুকু। সেদিন মিছরি-বৌদির কথায় প্রতিবাদও করতে পারিনি সেই জন্যে। জানতাম অমরেশের হাতে মিছরি-বৌদির ইহলীলা একদিন হঠাৎ অকালে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবেই শেষ হয়ে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই আর তার।

অমরেশ গাড়িতে তুলে দিতে আসবার সময় বলেছিল, 'তুই বোধহয় ও-সব চর্চা-টর্চা ছেড়ে দিয়েছিস্, না রে ?'

আমি কিছু উত্তর দিইনি।

খানিক থেমে অমরেশই বলেছিল, 'যদি দীর্ঘ পরমায়ু পেতে চাস্ তো, একসারসাইজ্‌টা ছাড়িস্‌নে, বুঝলি ?'

কিন্তু তখন আমার চোখের সামনে মিছরি-বৌদির জ্বলন্ত উদাহরণটা স্পষ্ট ভেসে রয়েছে। আমি সেদিন ভালো করে কথাই বলিনি অমরেশের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত।

এ-ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। জব্বলপুরের দিকে আর যাওয়া হয়নি। মিছরি-বৌদির খবরও আর পাইনি। অমরেশের সঙ্গেও আর দেখা হয়নি।

এতদিন পরে আবার জব্বলপুর স্টেশনে মিছরি-বৌদির সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে—সেই মিছরি-বৌদি এমন স্বাস্থ্যবতী হল কেমন করে ! তবে কি অমরেশ শেষ পর্যন্ত নিজের সিস্টেমে সব রোগ সারিয়ে দিলে মিছরি-বৌদির ! নাকি ডাক্তারের কোনো ভালো ওষুধে কাজ হল শেষ পর্যন্ত।

সাইকেল-রিক্‌শায় চলেছিলাম দুজনে। নেপিয়ার টাউনের বাজারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিছরি-বৌদি বললে, 'এই দেখুন ঠাকুরপো, এই আমাদের ইস্কুল।'

'ইস্কুল ! ইস্কুলে পড়েন নাকি ?'

'না, বুড়ো বয়সে আর পড়বো কেন ? পড়াই।'

'মাস্টারি করেন ?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'হ্যাঁ, মাস্টারিই তো। আজ সাত বছর এই এক ইস্কুলেই কেটে গেল।'

কিন্তু কথাটা শুনে কেমন যেন অবাক্ হয়ে গেলাম ! অমরেশ কি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে দিয়ে চাকরি করাচ্ছে ! তবে হয়ত চাকরি করছে বলেই

স্বাস্থ্যটা ভালো হয়েছে মিছরি-বৌদির। সারাদিন ঘরে বসে থাকলে শরীর মন কিছুই কি ভালো থাকে? ভালোই হয়েছে, মনে মনে ভাবলাম।

জিগ্যেস করলাম, 'মাস্টারি আগে কি করেছিলেন কখনও?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'ওমা, মাস্টারি করতে যাবো কেন, আমারই বলে তিন-তিনটে মাস্টার ছিল, তখন বাবা বেঁচে ছিলেন—সকালে একজন পড়াতো ইংরেজী, বিকেলে অঙ্ক আর রাত্রে হিস্ট্রি; কিন্তু তখন অত পড়েও দেখুন স্বাস্থ্য খারাপ হয়নি; বিয়ে হবার পর থেকেই যে কী হল—'

বললাম, 'কিন্তু এখন তো আপনার চেহারা একেবারে বদলে গেছে।'

মিছরি-বৌদি বললে, 'তাই তো আপনি আমাকে চিনতে পারেননি—আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনেছি, ঠাকুরপো।'

একটা দোকানের সামনে এসেই মিছরি-বৌদি রিক্‌শাওয়ালাকে থামতে বললে। আমাকে বললেন, 'আপনি একটু বসুন ঠাকুরপো, দোকানে একটা জিনিস কেনবার আছে আমার।'

মিছরি-বৌদি নেমে গেল। আমি ভালো করে দেখতে লাগলাম পেছন থেকে। আশ্চর্য! চেনাই যায় না আর সেই আগেকার মিছরি-বৌদিকে। সারা শরীরে আগে যেখানে তীক্ষ্ণতা ছিল, এখন সেখানে নিটোল নিভাঁজ লাবণ্য। সুডৌল, পরিপূর্ণ, নরম মিছরি-বৌদি। অথচ অমরেশ মিছরি-বৌদিকে নিয়ে কী লোফালুফিই না করেছে একদিন। দোল খাইয়ে, ঘোড়ায় চড়িয়ে মোটা করবার জন্যে অমরেশের বকুনির আর অন্ত ছিল না। কিন্তু এ পরিবর্তন হল কী করে!

মিছরি-বৌদি ঘামতে ঘামতে এল। হাতে একগাদা জিনিস-পত্তোর।

আবার রিক্‌শায় উঠে আমার পাশে বসে রিক্‌শাওয়ালাকে বললে, 'চল্, জল্‌দি জল্‌দি চল্—'

আমার দিকে চেয়ে মিছরি-বৌদি বললে, 'মোটা হওয়ার অনেক বিপদ, ঠাকুরপো—দেখছেন কী ঘামছি! অথচ আগে কত ওষুধ খেয়েছি, কত বকুনি

খেয়েছি ওঁর কাছে এই জন্যে। বলতেন,—তোমাকে নিয়ে সমাজে বেরোতে আমার লজ্জা করে। তা বলুন তো ঠাকুরপো, এখন কি আমাকে ভালো দেখায় ?'

বললাম, 'তা দেখায় বৈকি !'

'আর আগে ?'

বললাম, 'আগেও ভালো দেখাত, তবে এখন আরো ভালো দেখায়।—তা অমরেশ কী বলে ?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'উনি আর কী বলবেন ? আমার দিকে চেয়ে দেখলে তো ! কেবল নিজের স্বাস্থ্য নিয়েই ব্যস্ত। এই দেখুন না, বিস্কুট লজেন্স নিয়ে যাচ্ছি ওঁর জন্যে !'

'অমরেশ লজেন্স খাবে নাকি বুড়ো বয়েসে ?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'কেবল খাবার জন্যে যখন বায়না ধরেন তখন ছু'টো লজেন্স দিয়ে বলি চোষো, নইলে বড় বিরক্ত করেন কিনা ! আর আমি তো সারাদিন ইস্কুলে, সকালবেলা খাইয়ে দাইয়ে রেখে ইস্কুলে চলে আসি, সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

কেমন যেন অবাক্ লাগলো। কিছুই বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'আজকাল অমরেশ সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোয় নাকি ?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'সকাল-সন্ধ্যে-বিকেল সব সময়েই ঘুমোচ্ছেন, আমি তো তাই বলি—অত ঘুম ভালো নয়, সারাদিন ঘুমোলে ক্ষিদে তো পাবেই, তাই বিছানার পাশে এই বিস্কুট, লজেন্স, আপেল, কমলালেবু ছাড়িয়ে কেটে রেখে আসি। আমারও তো চাকরি ঠাকুরপো, বেশি কামাই করলে আমাকেই বা চাকরিতে রাখবে কেন ? আজকাল তো পয়সা ফেললে লোকের অভাব হয় না—চাকরির বাজার তো দেখছি।'

আরো আশ্চর্য লাগলো।

বললাম, 'সারাদিনই ঘুমোয় অমরেশ তো, আপিস যায় কখন ?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'উনি তো রিটায়ার করেছেন।'

রিটায়ার করেছে অমরেশ। এই বয়েসেই রিটায়ার করলো! চল্লিশও হয়নি যে।

মিছরি-বৌদি বললে, 'না, বুঝলুম না-হয় যে রিটায়ার করলে পুরুষ-মানুষের খারাপ লাগেই, বিশেষ করে ওঁর মতন ছটফটে মানুষের পক্ষে। কিন্তু তা বলে ঘুমোনো কেন পড়ে-পড়ে? বই পড়লেও তো হয়। ভালো ভালো বই লাইব্রেরী থেকে আনতে পারি, বললে উনি বলেন, পড়তে আর ভালো লাগে না। তা আমি বলি, বই পড়তে ভালো না লাগে ছবি আঁকো, ছবি আঁকা শেখো—আমি তুলি, রঙ, কাগজ কিনে দিচ্ছি—ছবি আঁকতে কী আর হাতী-ঘোড়া দরকার হয়, সময় কাটানো নিয়ে তো কথা। ভালো ছবি হতে হবে তার কী মানে আছে, তাতে অন্তত মনটা প্রফুল্ল থাকবে—মনটাই তো সব। মন খারাপ হলেই স্বাস্থ্য খারাপ—তা আমার কথা তো কোনদিনই শুনলেন না—'

জিগ্যেস করলাম, 'অমরেশ একসারসাইজ্ করে আজকাল?'

মিছরি-বৌদি বললে, সে-সব এখন চুলোয় গেছে, ঠাকুরপো। অন্য কিছু না করুন, ডাম্বেল দু'টোও তো ভাঁজতে পারেন—সে-সব মরচে পড়ছে! এবার ভাবছি বেচে দেব সব এতোয়ারী বাজারে পুরনো লোহার দোকানে। কত টাকার জিনিস বলুন তো, ঠাকুরপো। শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কী—'

জিগ্যেস করলাম, 'আর খাওয়া। খাওয়া সেই রকম আছে? তিরিশ-খানা রুটি, আর...'

মিছরি-বৌদি হাসলো, বললে, 'আছে, তবে সে-রকম আর নেই, সে-রকম তো আর পরিশ্রম হচ্ছে না। আগে ফ্যাক্টরিতে পরিশ্রম ছিল খুব, ফ্যাক্টরির ইলেকট্রিক করাতটা চালাতেন—সমস্ত প্ল্যাণ্টটারই তো ইনচার্জ ছিলেন। তা বাবা মারা না গেলে ওঁকে আরো উন্নতি করে দিয়ে যেতেন—বাবাও হঠাৎ মারা গেলেন আর ওঁরও...কিন্তু বাবাও বলেছিলেন ওঁকে,—ফ্যাক্টরির কাজে অত ছটফটে স্বভাব হওয়া ভালো নয়, বেশ ধীর স্থির হতে হবে, শুধু গায়ের জোরের কাজ নয়।'

চড়াই উতরাই রাস্তা। হঠাৎ যেন মনে হল, এ তো অন্যদিকে চলেছি!

জিগ্যেস করলাম, 'এ কোন্ দিকে চলেছেন, বৌদি?'

'কেন ঠাকুরপো, ঠিক দিকেই তো চলেছি। আমরা তো ফ্যাক্টরির বাঙলো ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল, এখন তো এতোয়ারী বাজারের কাছে বাড়িভাড়া নিয়েছি একটা, আমার ইস্কুলটা কাছে পড়ে, আর তা ছাড়া ওদিকে ভাড়াও একটু সস্তা—উনি পেনসন পান, আর...আর আমার ইস্কুলের চাকরি—সব দিক বুঝে শুনে তো চলতে হবে? একটা চাকর শুধু রেখেছি ওঁকে দেখবার জন্যে, আর রান্নাবান্না আমি নিজের হাতেই করে নিই—দু'টো লোকের তো রান্না। সেই চাকরই মাইনে নেয় কুড়ি টাকা করে।'

'এখানে চাকরের তো অনেক মাইনে?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'তা অনেক মাইনে কি সাধ করে দিই ঠাকুরপো, সবই তো করতে হয় তাকে—বাজার করা, হাট করা, জল তোলা। ওঁর দ্বারা তো একটা কুটো পর্যন্ত নেড়ে উপকার হবার নয়।'

বললাম, 'একেবারে স্রেফ বসে বসে খাচ্ছে নাকি?'

'বসে হলে তো বাঁচতুম ঠাকুরপো, শুধু শুয়ে। জানালা খোলা থাকলে পর্যন্ত বলেন,—ওটা বন্ধ করে দাও, চোখে আলো লাগছে। তা বলুন তো ঠাকুরপো, শরীরে একটু আলো হাওয়া লাগানো ভালো না? মনটা না হলে ভালো থাকবে কেন?'

কী জানি কেমন যেন অবাক্ লাগছিল। অমরেশ শেষকালে এমন হয়ে গেল! অথচ কতদিন কতভাবে নিজেই তো ও-সব উপদেশ দিয়েছে আমাদের। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ওমনিই হয়।

মিছরি-বৌদি বললে, 'এই তো আজ ছুটির দিন, আমাদের ইস্কুলের সেক্রেটারির ফ্যামিলি বম্বে যাচ্ছিল, তাই স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম, গিয়ে এখন চান করাবো ওঁকে—রান্না চড়াবো—কত কাজ পড়ে আছে।'

বললাম, 'তাহলে অমরেশের বাত হয়েছে বুঝি, বৌদি? খুব যারা একসারসাইজ করে তাদের কিন্তু এরকম বাত হয় শুনেছি।'

মিছরি-বৌদি বললেন, 'হয়নি। কিন্তু বাত হতে আর দেরিও নেই ঠাকুরপো, এই আপনাকে বলে রাখলুম।'

বলে রিক্শাওয়ালাকে বললে, 'এই—রাখ্, রাখ্—'

রিক্শা থামতেই নামলাম আমরা। সামনে চেয়ে দেখলাম, পুরনো ইটের গাঁথুনি-করা একটা বাড়ি। কয়েকটা ছাগলছানা, তুটো মুরগি চরে বেড়াচ্ছে সামনে। একটা মোটরের পুরনো মার্ডগার্ড মরচে ধরে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে আছে বাড়ির পাশেই। মিছরি-বৌদিকে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগলো এই পরিবেশের মধ্যে। সেদিন সেই অমরেশের বাঙলোতে যেমন সেই মিছরি-বৌদিকে মানায়নি, আজকের মিছরি-বৌদিকেও যেন এই এতোয়ারী বাজারের ভাড়াটে বাড়িতে মানালো না একেবারে!

জিনিসপত্তরগুলো হাতে করে নিয়ে মিছরি-বৌদি বললে, 'আসুন ঠাকুরপো, এই আমাদের বাড়ি।'

সেখানে যে ঘরে গিয়ে বসলাম, সেটাও যেন কেমন নোংরা-নোংরা মনে হল।

বললাম, 'অমরেশ কোথায়?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'শুয়ে আছেন নিশ্চয়ই। দেখি—'

বলে পরদা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি একলা চুপচাপ বসে রইলাম। দেওয়ালে সেইসব ছবিগুলো ঝুলছে—স্যাণ্ডো, এ্যাপোলো, হারকিউলিস।

মিছরি-বৌদি হঠাৎ দরজার পরদা সরিয়ে বললে, 'যা বলেছি তাই—এই দেখুন ঠাকুরপো—আপনার বন্ধুকে দেখে যান।'

গেলাম।

দেখলাম খাটের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে অমরেশ।

কিন্তু যাকে দেখলাম, তাকে অমরেশ বললে একটু ভুল হয়। সে অমরেশের প্রেতাত্মা যেন।

মিছরি-বৌদি বললে, 'দেখলেন তো ঠাকুরপো, আমি যা বলেছিলুম। এই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে শরীর থাকে, না, মন ভালো থাকে ?'

বলে হঠাৎ ডাকতে লাগলো, 'শুনছো, ওগো শুনছো, কে এসেছে দেখো।'

একটু ডাকতেই ঘুম ভেঙে গেল অমরেশের। ভাবলাম—এখনি আমাকে দেখে, হয়ত উঠে, পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেবে আনন্দের চোটে। কিন্তু কিছুই করলে না অমরেশ। শুধু বললে, 'কিরে, তুই এসেছিস্ ?'

বললাম, 'শুয়ে আছিস্ কেন ? বাইরে আয় না।'

অমরেশ বললে, বাইরে ?...'বাইরে নয়, তুই বরং এখানে বোস্—ওই চেয়ারটা টেনে নে।'

বললাম, 'ঘরের ভেতরে কেন ? বাইরে ওই ঘরে চল্ না।'

অমরেশ বললে, 'বাইরে যেতে পারি না।'

'কেন ?'

'পা যে কাটা, দুটো পা-ই···জানিস না তুই ?'

পা-কাটা! কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেছি।

অমরেশ বললে, 'কেন, খবরের কাগজে তো বেরিয়েছিল, ইলেকট্রিক স' মেসিনে পা ঢুকে গিয়েছিল—এই ছাখ।'

বলবো কি, সেদিন অমরেশের বাড়ি গিয়ে দিনটা যে কী করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। আমি তখন আকাশ-পাতাল ভাবছি। কিন্তু খানিক পরেই অবশ্য মিছরি-বৌদি আমায় দুর্ভোগ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনি একটু ও-ঘরে গিয়ে বসুন তো ঠাকুরপো—চান করিয়ে দিই ওঁকে—বেলা একেবারে পড়ে এল। আপনার কিন্তু খেতে একটু দেরি হয়ে যাবে ভাই, কিছু মনে করবেন না যেন।'

চেয়ে দেখি মিছরি-বৌদির হাতে বেড-প্যান।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে এসেছিলাম মনে আছে।

কিন্তু আজ এতদিন পরে একটা সত্যিকথা বলবো। সেদিন অমরেশের কাটা পা-দুটোর চেহারা দেখে মুখ দিয়ে যে একটা 'আহা' শব্দও বেরোয়নি,

সে শুধু মিছরি-বৌদির কথা ভেবেই। আমার যেন কেমন মনে হয়েছিল মিছরি-বৌদি হয়ত অমরেশের ওপর তার বহুদিনের পোষা রাগের প্রতিশোধ নিচ্ছে! আর, তা ছাড়া অমরেশের পা না কাটলে কি মিছরি-বৌদির স্বাস্থ্যই ফিরতো, না, মিছরি-বৌদিই এমন সুন্দরী হত!

এ-গল্পটা শুনেও সোনাদি বলেছিল, 'তুই আমায় কথা দে, দশ বছর তোর লেখা আর ছাপাবি না কোথাও।'

এখন বুঝতে পারি, সোনাদি কতখানি উদারতা নিয়ে আমার গল্পগুলো শুনতো। কিন্তু মতামতগুলো ছিল নিরপেক্ষ। আমাকে বার বার কেবল লেখা ছাপতে বারণ করেছে। বলেছে, 'লেখা ছাপতে এত আগ্রহ কেন তোর? লেখা ছাপা হলেই কি মহা-লেখক হয়ে যাবি?'

সব দিক থেকে যখন হতাশ হয়ে আর কোথাও যাবার মত জায়গা থাকতো না আমার, তখন যেতাম সোনাদির বাড়ি। কিন্তু না-গেলেও কোনদিন কোনো অনুযোগ শুনিনি সোনাদির কাছে। এ শুধু আমার ব্যাপারেই নয়। ছেলেমেয়েদের অসুখেও কোনো উদ্বেগ দেখিনি কখনও। মনে হোত সোনাদি যেন সারা পৃথিবীতে একলা। দাশসাহেব, স্বামীনাথ-বাবু কেউ-ই তাকে সঙ্গ দিয়ে সুখী করতে পারেন নি। সোনাদিকে স্ত্রী পেয়েও স্বামীনাথবাবু যেন তাকে বেশি কাছে পাননি! দাশসাহেবের বাড়িতে থাকলেও যেন দূরে চলে যায়নি সোনাদি! নিজের চারদিকে এক দুর্ভেদ্য রহস্য-জাল জড়িয়ে রাখে অনেকে। সোনাদির তা-ও ছিল না। সহজ-সরল স্বাভাবিক ব্যবহার সোনাদির। তবু সোনাদিকে কাছে পাবার গৌরব কারো কপালেই যেন নেই। সোনাদি যেন কাছে থেকেও সুদূর, আবার দূরে গেলেও যেন দূরে যায় না। সোনাদি কারো কোনও কাজে কোনদিন আপত্তি করেনি, তবু কোনো কাজ করতে গেলে যেন সোনাদিকে না জিগ্যেস করলেও চলবে না!

জব্বলপুরে সোনাদির যে-আচরণ অনেকের চোখে অস্বাভাবিক মনে

হয়েছে, দাশসাহেবের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসার পর তা যেন তাদের চোখে অসঙ্গত মনে হল। কেউ আর সোনাদিকে বুঝতে পারলো না। কিন্তু বুঝেছিলেন বোধহয় স্বামীনাথবাবু। তিনি সোনাদিকে অল্পদিনেই চিনে নিয়েছিলেম তিনি জানতেন এবং বিশ্বাসও করতেন, বাইরের সেবার দ্বারা যে পুজো তার চেয়ে হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা যে ভোগ তা বড় জিনিস। তিনি বুঝেছিলেন—ভেতরটা যেখানে সম্পূর্ণ, বাইরেটা সেখানে বাহুল্য। সংসারে এক-একজন মানুষ থাকে যারা নিজেদের বিকীর্ণ না করে বাঁচতে পারে না। অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তি, সেইখানেই পূর্ণতা বলে তারা বিশ্বাস করে না। অথচ জীবনে সমাপ্তিটা যেমন সত্যি, ব্যাপ্তিটাও তার চেয়ে কম সত্যি নয়। ভাব যদি সত্যি হয়, তো প্রকাশ কম সত্যি নয় তা বলে। পরিণতি যদি সত্যি বলে মানি, পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করতে পারিনে কোনও কারণেই।

তা একদিন দাশসাহেব জব্বলপুরের চাকরি থেকে বদলি হয়ে চলে এলেন কলকাতায়।

রতি আর শিশু বায়না ধরলে 'তুমি আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে না, মা?'

দাশসাহেব বললেন, 'তুমি আদর দিয়েই ওদের বাড়িয়ে দিয়েছ।'

শেষে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। জিনিসপত্তোর বাঁধা-ছাঁদা হল। দাশসাহেব বললেন, 'কলকাতায় গিয়ে ওদের নিয়ে একলা মুশকিলে পড়বো—'

সোনাদি বললে, 'তুমি তোমার অফিসে যেয়ো, আমি দেখবো ওদের।'

'তুমি?'

স্বামীনাথবাবুকে গিয়ে সেদিন সোনাদি বললে, 'পরশু দাশসাহেবের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি, তোমার আপত্তি নেই তো?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'হাওয়া বদলালে তোমারও শরীরটা ভালো হবে।'

'হাওয়া বদলাতে তো যাচ্ছি না।'

'তবু কলকাতায় তো অনেকদিন যাওনি, দেখাশোনা হবে অনেক লোকের সঙ্গে।'

সোনাদি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু কেন আমি কলকাতায় যাচ্ছি, তা তো জিগ্যেস করলে না?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তুমি ভালো বুঝেছ তাই যাচ্ছ, তুমি তো অবুঝ নও।'

'কিন্তু পুঁটুকে একলা দেখতে পারবে তো তুমি?'

'পুঁটুর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না।'

'আসছে মাসের পনরোই পুঁটুর জন্মদিন, নতুন জামা-কাপড় কিনে দিয়ো, আর কানের একজোড়া দুলও ওকে দিয়ো—এই চুড়িটা ভেঙে গড়িয়ে দিয়ো।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'টাকা তো রয়েছে, চুড়িটা তুমি রাখো।'

'তা হোক, তবু নাও।'

স্বামীনাথবাবু প্রতিবাদ কখনো করেননি। হাত বাড়িয়ে নিলেন।

যাবার দিন সোনাদি বললে, 'জিগ্যেস করলে না তো, কবে আসবো?'

'তুমি তো আমার চেয়ে ভালো বোঝো। যতদিন খুশি থেকো, তারপর রতি-শিশুকে বুঝিয়ে রেখে একদিন এসো।'

ননদদের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। যার-যার শশুরবাড়িতে তারা। বিশ্বেশ্বরবাবুও মারা গেছেন আজমীরে। আত্মীয়-পরিজন যারা রাজস্থানে ছড়িয়ে ছিল, তারাও আর যোগাযোগ রাখেনি। পরিবারের বৃহৎ শাখা-প্রশাখা। কে কার খবর রাখে?

সেই সময়ে দাশসাহেব ছেলেমেয়ে নিয়ে জব্বলপুরের সংসার তুলে নিয়ে কলকাতায় এলেন।

স্টেশনে স্বামীনাথবাবু তুলে দিতে এসেছিলেন পুঁটুকে নিয়ে।

সোনাদি বললে, 'আধসের করে দুধ নিয়ো রোজ নিজের জন্যে।'

'আমার জন্যে ভেবো না বেশি, নিজের শরীরের দিকে নজর রাখবে।'

সোনাদি বললে, 'পুঁটুর ইস্কুলে খাবার পাঠাতে ভুলো না যেন।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'গিয়ে চিঠি দিয়ো।'

ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

পুঁটু জিগ্যেস করলে, 'মা কোথায় গেল বাবা ?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'মা তো কোথাও যায়নি মা, কাঁদতে নেই, ছি —আমি কি কাঁদছি ?'

কলকাতায় এসে দাশসাহেব নতুন বাড়িতে বাসা করলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা ব্যাঙ্ক করলেন। ব্যাঙ্কের নামটা আপনারাও জানেন। নামটা আমার মুখে না বলাই ভালো। রতি আর শিশু নতুন ইস্কুলে ভর্তি হল। সেখানেই ওই অসুখটা সুরু হল সোনাদির। সেই অদ্ভুত অসুখ। কিছু কাজ করতে পারবে না। ডাক্তারে বললে,—শুধু শুয়ে বসে থাকতে হবে। অথচ খাওয়া-দাওয়ার কোনো বাছ-বিচার নেই।

ডাক্তার আরো বললে, 'এ-ও একরকম টি-বি।'

সোনাদি বললে, 'রতি-শিশুকে তুমি দূরে বোর্ডিং ইস্কুলে পাঠিয়ে দাও।'

দাশসাহেব তাই-ই করলেন।

'আর তুমি ?'

'আমার কথা বলছো ?'

সোনাদি বললে, 'আমার কাছে তুমি এসো না, রোগটা ভালো নয়।'

দাশসাহেব হাসলেন। বললেন, 'তোমার কাছে কেউ আসতে পারে, এমন কথা কোনো আহাম্মকেও বলবে না, সোনা।'

তারপর খানিক থেমে বললেন, 'জব্বলপুরে স্বামীনাথবাবুকে একটা খবর দিই, কী বলো—হয়ত ভাববেন খুব।'

সোনাদি বললে, 'খবরটা পরে দিলেই চলবে, তাড়াতাড়ি কী ?'

বলে হাসলো সোনাদি।

ননদরা এসে জিগ্যেস করে, 'বৌদি কোথায় দাদা ?'

সব শুনে তারাও অবাক্ হয়ে যায়। বলে, 'তুমি একটু কড়া হতে পারো না দাদা ?'

স্বামীনাথবাবু হাসেন।

'তুমি হাসছো ?'

তবু স্বামীনাথবাবু হাসেন।

বলেন, 'তোরা শুধু বাইরেটাই দেখিস, লোকে কী বলবে এইটেই ভাবিস ; আমি তো কিছু তফাত দেখতে পাই না, আমার মনে হয় ও এখানেই আছে—'

ননদ বলে, 'তুমি কি পাথর দাদা ?···সত্যি বলো তো কিছু ঝগড়া হয়েছিল বুঝি ?'

'ঝগড়া করবার মতো লোকই বটে রে সে, চোখের সামনে দেখলেও আমি তা বিশ্বাস করবো না।'

'তোমার কথা ছেড়েই দিলাম, তুমি না হয় দেবতা, কিন্তু তার ওই নিজের পেটের একফোঁটা মেয়েটা।'

'তা পুঁটুর তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—অসুবিধে হচ্ছে নাকি ?'

'জন্ম দিয়েই যে কত ছেলের মা মারা যায়, তাতে কি অসুবিধে হয় তাদের ? কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে যে মুখ দেখাতে পারবো না দাদা।'

'তোর তো বড় কষ্ট হবে তা হলে ?'

'কষ্ট ! তুমি বলছো কি দাদা, আমার যে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছে।'

'তুই ওঁদের বলিস, আমার অনুমতি নিয়েই সে গেছে।'

'বৌদিকে তো জানি, তোমার অনুমতি নিতে তার বয়ে গেছে।'

'নারে, অনুমতি নিয়েছে, আর মুখ ফুটে অনুমতি চাওয়াটাকেই কি তোরা বড় ভাবিস—আর তা ছাড়া এই একটা জীবনে আমাদের কতবার জন্ম নিতে হয়, জানিস তুই ? মহাভারতে পাণ্ডবদের জীবনে অজ্ঞাতবাসের পালা এসেছিল একবার, সেটা কি ভাবিস একেবারে অর্থহীন ? তা তো নয়, আমি মনে করি সেটা তাদের আর এক নবতর জন্মের উদ্যোগপর্ব—তা এসব কথা তোর শ্বশুর-শাশুড়ীরা যদি না বোঝেন তো বলিস তাঁদের

যে, যাকে অনুমতি দিতে পারলে কৃতার্থ হয় লোক, তার অনুমতি চাওয়া-না-চাওয়া তুচ্ছ—'

'যদি কখনও ফিরে আসে বৌদি তো বাড়িতে তাকে ঢুকতে দিয়ো না দাদা, আমাদের বংশের মুখ পুড়িয়েছে সে।'

'ও কথা বলিসনি, ওতে আমার কষ্ট হয় রে।'

'কষ্ট তোমার ছাই হয়, দাদা।'

'না রে, তাকে ছাড়া আমি একদিনও থাকতে পারি না, সত্যি বলছি।'

'তবে এখন আছো কেমন করে ?'

সে তো আমার কাছেই আছে সব সময়, মনে হয় যেন পাশের ঘরেই আছে, ডাকলে সাড়া দেবে, যেমন তার বই নিয়ে পড়াশোনা করতো তেমনি করছে ! 'জীব অনু, না বিভু' এই নিয়ে তার সমস্যার আর শেষ নেই। তোর বৌদির ওপর তোরা অবিচার করিস নে—'

বিকেলবেলা ননদ বললে, 'পুঁটুকে আবার দুধ পাঠাচ্ছ ইস্কুলে, দাদা ?'

'কিন্তু সে যে দুধ পাঠাতে লিখেছে সেখান থেকে।'

'কাল তো দুধ খায়নি ও, ফেলে দিয়েছে যে সবটা।'

'তা হলে আবার চিঠি লিখে পাঠাই।'

'এ-ও তাকে জিগ্যেস করতে হবে, দাদা ! তোমার কি নিজের কিচ্ছু করবার ক্ষমতা নেই ?'

'সে-ই যে এ-সংসারের গিন্নী রে, তাকে না জিগ্যেস করে কি কিছু করতে পারি ?'

'সংসার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে যে চলে গেছে, তার তো এ সংসারের জন্যে ভারি মাথাব্যথা !'

দাশসাহেব অফিসে যান। গিয়ে একবার ল ফোন করেন, 'কেমন আছো, সোনা ?'

সোনাদি বলে, 'তোমার ব্লাড-প্রেসারটা যদি সারে তো কী বলেছি !'

অভিলাষকে ডেকে বলে দিলে সোনাদি, 'তোমার সাহেবকে খেতে দেবার আগে আমাকে জিগ্যেস করে দিয়ো এবার থেকে।'

সকালবেলা সোনাদি বলে, 'কাল অনেক রাত্রে তোমার ঘরে আলো জ্বলছিল কেন ?'

'ঘুম আসছিল না যে।'

'কাল থেকে যেন আলো না দেখতে পাই আর।'

তা এই ঠিক এমনি সময়ে আমি এসে পৌঁছুলাম সোনাদির জীবনে। জীবনে অনেক রকম চরিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু অদ্ভুত লাগলো! কোথাও কোনো বিরোধ নেই! রাত ন'টা বাজলেই সোনাদি দাশ সাহেবকে বলে, 'যাও, ন'টা বাজলো, এবার শোওগে যাও, গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেবে।'

দাশসাহেব হয়ত মৃদু প্রতিবাদ করেন, 'ঘুম এখন আসবে না আমার।'

'না আসুক, শুয়ে থাকোগে।'

নিঃশব্দে দাশসাহেব চলে যেতেন। যেন ছোট শিশুটি দাশসাহেব—ঘুম পাড়িয়ে তবে সোনাদির স্বস্তি। এক-একবার মনে হত সোনাদি বুঝি আমাদের সকলের মা, আর আমরা সবাই ছেলে-মেয়ে। ওই স্বামীনাথ-বাবু, দাশসাহেব, আমি, রতি, শিশু, পুঁটু—সবাই।

এক-একদিন এরই ফাঁকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মাইলের পর মাইল দূরে চেতলা থেকে আপার সারকুলার রোড। সেখানে 'প্রবাসী' অফিস। সাইকেলটা উঠোনে চাবি দিয়ে বেঁধে দুরু-দুরু বুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গিয়ে উঠি। সোনাদি যতই বলুক, 'প্রবাসী'তে লেখা না ছাপা হলে স্বস্তি পাই না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপা না হলে জীবনই বৃথা। সদ্য দেখে এসেছি আমার গল্প বেরিয়েছে 'ছায়ার মায়া'। ব্রজেনবাবু থাকতেন ডানদিকের ঘরে সামনের চেয়ারে। বড় গম্ভীর মানুষ। দেখলে ভয় হত।

বললেন, 'কী চাই ?'

বললাম, 'একটা গল্প ছাপা হয়েছে এ-মাসে।'

'কার গল্প ? দাদার ?'

ছোট ছেলে দেখে বোধহয় বিশ্বাস হয়নি।

বললাম, 'আমার—'

যেন না জেনেশুনে মহা অপরাধ হয়ে গেছে তাঁর! অন্তত এত কম বয়েস আগে জানলে যেন লেখা ছাপতেন না। অতি রূঢ় ব্যবহার। কোনও আশা বা উৎসাহ পেতাম না সে-দৃষ্টিতে। অথচ কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। একটার পর একটা গল্প ছাপিয়েছেন, কিন্তু দৃষ্টির রূঢ়তা তবু একতিল কমেনি। তারপর আবার সেখান থেকে সাইকেল নিয়ে যেতাম 'ভারতবর্ষ' অফিসে। গায়ের জামা খুলে দিয়ে জলধর সেন মশাই ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন। কানে খাটো ছিলেন। জোরে জোরে সমস্ত অফিস-সুদ্ধ লোককে শুনিয়ে নিজের নিজের নিবেদন জানাতে হয়।

বলেন, 'আমার গল্পটা তুমি 'প্রবাসী'তে ছাপিয়েছ নাকি?'

বললাম, 'না, ওটা অন্য গল্প।'

'যাবে, যাবে, আসছে মাসে যাবে।'

বুকে ভরসা নিয়ে সেখান থেকে যেতাম 'বিচিত্রা' অফিসে। উপেনবাবু কিন্তু বসতে বলতেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গল্প করতেন। উৎসাহ দিতেন। মর্যাদা দিতেন। আবার লেখা দিতে বলতেন। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তারপর সারারাত ধরে আমার লেখা চলতো আবার। এক-একদিন ভোর হয়ে যেত। তখন আবার লেখাটা নিয়ে কোনো বন্ধুকে গিয়ে পড়িয়ে শুনিয়ে এসেছি। কিন্তু সোনাদিকে পড়াতে তবু ভয় করতো। কত লোভ হত। মনে হত—এবার হয়ত সোনাদি ভালো বলবে। এবার হয়ত ছাপাতে অনুমতি দেবে। কিন্তু সামলে নিতাম নিজেকে। মনে হত—সোনাদির ভালো লাগবার মতো লেখা কবে লিখতে পারবো! কবে সোনাদির পছন্দমতো হোমারের 'ইলিয়ড,' 'অডিসি' কিম্বা কাদম্বরীর মতো কাব্য কিম্বা বাল্মীকি বেদব্যাসের মতো 'রামায়ণ', 'মহাভারত' লিখতে পারবো! কবে তেমন লেখা আমার হাতে বেরোবে।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রায় তখন মাসের পর মাস গল্প বেরিয়েছে।

আমার এক বন্ধু একদিন বললে, 'দেশ' কাগজে একটা লেখো, ও-কাগজটা ভালো হচ্ছে আজকাল—'

মনে আছে 'আমীর ও উর্বশী' গল্পটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম একদিন। কাউকেই চিনি না।

বন্ধু পরের দিন জিগ্যেস করলে, 'কী নিয়ে লেখা?'

মুখে বললাম সব গল্পটা।

বন্ধু শুনে বললে, 'ও-গল্প ওখানে ছাপবে না, ও-কাগজের পক্ষে একটু কড়া হয়েছে।' কী জানি কেন—আমারও মনে হল হয়ত তাই। সেই রাত্রে আর একটা গল্প লিখে পরদিন নিয়ে গেলাম হাতে করে।

শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ বসেছিলেন। গিয়ে নিজের নাম বললাম। আরো বললাম, 'পুজো-সংখ্যার জন্যে একটা গল্প দিয়ে গিয়েছিলাম, আমার এক বন্ধু বললে, ওটা নাকি আপনাদের কাগজে ছাপার মতো নয়—তা আমি আর একটা লেখা নিয়ে এসেছি—'

শুনে তিনি খুঁজে খুঁজে বার করলেন 'আমীর ও উর্বশীর' পাণ্ডুলিপিটা। বললেন, 'আপনি বসুন, আমি পড়ে দেখছি গল্পটা।'

তারপর চুপ করে অধীর আগ্রহ নিয়ে আমি সেইখানে বসে রইলাম, আর তিনি পড়তে লাগলেন। এক-একটা মিনিট যেন আর কাটতে চায় না! মনে হয় বিচারকের সামনে যেন নিজের দণ্ড শোনবার প্রতীক্ষায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

এক সময়ে তিনি মুখ তুলে বললেন, 'গল্প খুব ভালো হয়েছে, এটা যাবে, আমি ছাপবো এ-গল্প।'

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি ছাপাবেন, ওতে যে…'

'যা-ই থাক, আমি ছাপবো।'

তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি যেন মরিয়া হয়ে বলছেন, 'আমি ছাপবো, কিছু হবে না।'

কিন্তু তবু সোনাদিকে সে-গল্প পড়াতেও আমার সাহস হয়নি। ছাপলেই যেন অপরিণত বয়েসের লজ্জা চিরস্থায়ী হয়ে রইল। এপিক্

ছাড়া সোনাদির আর কিছুই ভালো লাগে না। বাজারচল্‌তি লেখা সোনাদির কাছে সব অপাঠ্য। ব্রজেনবাবু, জলধরবাবু, উপেনবাবুরও যে-লেখা ভালো লেগেছে, সোনাদির যেন তা ভালো লাগবার কথা নয়! ভাগ্যিস সোনাদি ও-সব পত্রিকা কিছুই পড়ে না, নইলে আমার হয়ত ও-বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ হত!

সেদিন সোনাদিকে আমার 'রাঙা মাসিমা'র গল্পটা বলেছিলাম। রাঙা মাসিমার গল্পটা তখনও লেখা হয়নি। শুধু নোট্‌ বইতে স্কেচ করে রেখেছি।

মাসিমা আর মেসোমশাই-এর সম্পর্কটাও আমার কাছে বড় বিচিত্র লাগতো বরাবর।

মা বলতো, 'আহা! কী কপাল করেই যে এসেছিল রাঙাদি—'

সতিই হিংসে করবার মতো কপালই বটে রাঙা মাসিমার। খুব ছোটবেলায়, মনে পড়ে, রাঙা মাসিমার বাড়ি গেছি। তখন ভাড়াটে বাড়ি ছিল। রাঙা মাসিমা নিজের হাতে রান্না করা, ময়লা কাপড় সেদ্ধ করা, যাবতীয় কাজ করেছে। মেসোমশাই পর্যন্ত কখনও মুড়ি ছাড়া আর কিছু জলখাবার পায়নি।

আমাকে দেখিয়ে মেসোমশাই বলেছে, 'ওকে দুটি মুড়ি দাও না।'

মাসিমা বলেছে, 'ওরা আর মুড়ি খায় না আমাদের মতন।'

তারপর হাতের কাজ করতে করতে বলেছে, 'ওর বাবা তোমার মতো আর অকম্মা লোক নয়—ওদের তনজনের সংসার, তবু চার সের দুধ নেয় ওর মা, জানো?'

মেসোমশাই বলেছে, 'তা মুড়ি কি খারাপ জিনিস, গা। বর্ষাবাদলের দিনে তেলনুন মেখে খেতে তো বেশ লাগে আমার।'

রাঙা মাসিমা রেগে গিয়ে বলেছে, 'তোমার মতো লোকের হাতে পড়ে মুড়ি ছাড়া যে আর কিছুই জুটবে না তা আমি জানি। যেমন ফুটো কপাল আমার!'

তখনও মেসোমশাই জজ্‌ হয়নি। সামান্য উকিল মাত্র। বউবাজারের একটা গলিতে সে যে কী বাড়িতে থাকত! একখানা মাত্র শোবার ঘর।

তারি মধ্যে ঢালোয়া বিছানা। তিন-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই একটা ঘরের মধ্যে থাকা। আর রান্নাঘরটা গোলপাতার ছাউনি। সেই এক চিল্‌তে রান্নাঘরের মধ্যে দিনরাত কাটতো মাসিমার। কিন্তু তবু কত যে পরিপাটি কাজ! রান্না সারা হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে, মেসোমশাই কোর্টে—তখন যত রাজ্যের কাজ মাসিমার। বড়ি শুকোতে দিয়েছে রোদ্দুরে, ক্ষার কাচতে বসেছে, কিংবা চাল বাছতে শুরু করেছে কুলো নিয়ে। একটা ঝি নেই, চাকর নেই!

মেসোমশাই কতবার বলেছে, 'একটা বিধবা মেয়েমানুষ আছে, ওরা বলছিল—মাইনে নেবে না, শুধু খাবে—রাখলেও তো পারো।'

রাঙা মাসিমা ঝাঁজিয়ে উঠত, 'থামো তুমি, তোমার মতো অকম্মা লোকের হাতে যখন পড়েছি, তখন জানি আমার কপালে কষ্ট আছে—জিগ্যেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু ওর মাকে কখনো নিজে রাঁধতে হয়নি।'

মেসোমশাই বলত, 'তা বলে তোমার একটা অসুখ-বিসুখ করলে তখন?'

মাসিমা বলতো, 'অসুখ-বিসুখ হলে তো বেঁচে যাই, আমাকে আর ভূতের বেগার খাটতে হয় না তোমার সংসারে।'

মেশোমশাইকে দেখেছি ভোর বেলা উঠে নিজের হাতে নিজের জামা-কাপড় কেচে, ঘর পরিষ্কার করে বাইরের ঘরে কাজ নিয়ে বসে গেছে। তারপর চট করে এক ফাঁকে মক্কেলকে বসিয়ে রেখে বাজারও করে এনেছে।

মাসিমা দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠেছে।

'ওকি' মাছের থলি আর আনাজের থলি একাকার করে ফেললে যে, ছিষ্টি আঁশ করে ফেললে যে তুমি, অমন বাজার করবার মুখে আগুন—নাও, হাত ধোও।'

নিজেই জলের ঘটি নিতে যাচ্ছিল মেসোমশাই।

আবার হৈ হৈ করে উঠেছে মাসিমা।

এ-সব কথা যখনকার তখন আমরা খুব ছোট। তারপর বউবাজারের বাড়ি ছেড়ে মেসোমশাই কলেজ স্ট্রীটের ওপর সদর রাস্তায় বাসা নিয়েছে। আয় বেড়েছে। ছেলে-মেয়েদের বয়েস হয়েছে। খুকুর বিয়ে হয়ে গেছে এক বড় ঘরে। খুকুর বিয়েতে মেসোমশাই জাঁকজমক করেছিল খুব। সে-বিয়েও মেসোমশাইয়ের এক মক্কেলের কল্যাণেই। একটা পয়সা নেয়নি পাত্রপক্ষ। মক্কেলরা গাদা-গাদা জিনিসপত্তোর দিয়ে গেছে বাড়িতে বয়ে। ধন্য ধন্য করেছে সব আত্মীয়-স্বজন নতুন কুটুম দেখে। বরকর্তা বলেছে, 'জিতেনবাবু এমন সজ্জন লোক, তাঁর মেয়ের বিয়েতে আমরা টাকা নেব না।' কেবলমাত্র মেসোমশাইকে দেখেই পাত্রী পছন্দ করেছে তারা। এমন সাধুলোকের মেয়ে ঘরে আনতে পারাও যে বহু পুণ্যের ফল।

মাসিমা কিন্তু তখনও সেই ভিড়ের মধ্যে বলেছে, 'ওঁর সাধ্যি কি ওই মেয়ে পার করেন, যা দেখছো মা, সব এই আমি-হেন মেয়ে ছিলাম বলে—কোনো যুগ্যিতা নেই তো ওঁর।'

গায়ে-হলুদ দেখে সব লোক অবাক্। মেয়েকে দিতে আর কিছু বাকি রাখেনি।

মাসিমাও গরদের জোড় পরে বললে, 'দেখছ তো মা তোমরা ওই অকম্মা মানুষটিকে, সেই মেয়ে-দেখার সময় থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু সব আমাকে করতে হচ্ছে, একটা কাজ তো ওঁকে দিয়ে হবার উপায় নেই।'

মেসোমশাই সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মাসিমা বললে, 'হাসছ কি, এই তো সবাই সাক্ষী আছে, বলুক দিকি কেউ তুমি কোন্ কাজটা করেছ, যে-কাজটা আমি দেখবো না সব তো পণ্ড করবে, এমন কপাল আমার মা, যে একা হাতে সব কাজ করতে হবে!'

সত্যি, মাসিমাও মেসোমশাইকে দেখে এক-একবার অবাক্ হয়ে যেত। বলত, 'আমায় একবার কাছারিতে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে, তুমি কেমন করে কাজ চালাও সেখানে।'

উকিল থেকে আস্তে আস্তে মেসোমশাই জজ্ হল। গোলদীঘির পেছনে মস্ত বাড়ি কিনলে। নন্টু তখন ডাক্তারি পাশ করে রেলে চাকরি নিয়েছে। মেজ ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে কাশী থেকে। জম্-জমাট সংসার। তিনটে চাকর, দু'টো ঝি। আত্মীয়-স্বজন, নাতি-নাতনি, বিধবা-সধবা গলগ্রহের কল-কোলাহলে বাড়ি পূর্ণ। তার মধ্যে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মাসিমার কেবল ওই এক কথা !

'হলে কি হবে মা, আমি যেদিকে দেখব না, সেইদিকেই তো[illegible]ত্তির ! যেমন হয়েছে বাড়ির অকম্মা কর্তা, তেমনি সবাই, একটা মানুষ যদি [illegible]াজের ···সবাই এ বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে !'

গৃহ-প্রবেশের দিনে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে।

গিয়েই মাসিমার গলা শুনতে পেলাম। বলছে, 'আচ্ছা, তুমি অকম্মা মানুষ, তুমি আবার কাজের ভিড়ের মধ্যে কেন শুনি—'

মেসোমশাই বুঝি নিজের গামছার খোঁজে এসেছিল অন্দরমহলের ভেতর। মাসিমার মন্তব্য শুনে আবার যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। কোন বিরক্তি নেই, বিরাগ নেই—সদাশিব ধীর স্থির শান্ত মানুষটি বরাবর। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের ধৈর্য, সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা দিয়ে অক্লান্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বিত্তশালী হয়েছে, কিন্তু কোনো হিংসা, ক্ষোভ, দুর্ব্যবহার নেই কারো ওপর।

মাসিমা বলে, 'এও বলে রাখছি বাপু তোমাদের (তোমরা এখন বড় হয়েছ, সব বুঝতে পারো) এই আমার মতো গিন্নী পেয়েছিল বলেই তোমার মেসোমশাই এই বাড়ি-ঘর-দোর করতে পারলে কলকাতায়।'

পুত্রবধূদের ডেকে বলে, 'এই শোন বৌমারা, এই আজ আমাকে দেখছ তোমরা এমনি, এই আমিই একদিন ছেলে মানুষ করা থেকে এই কলকাতার বাড়ি করা পর্যন্ত সব একা করেছি। আমি না থাকলে ওই ছেলেরাও মানুষ হত না, মেয়েদের বিয়ে হত না। ওই অকম্মা মানুষ শুধু মাসে মাসে ক'টা টাকাই এনে তুলে দিয়েছে আমার হাতে, আর তো কোন যুগ্যিতা ছিল না ও-মানুষের।'

যে-মানুষের কোন যোগ্যতা ছিল না, সে-মানুষ সামান্য অবস্থা থেকে এত বড় কেমন করে হল এ-প্রশ্ন কেউ কোনোদিন করেনি মাসিমাকে। দিনে দিনে বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে ; পুত্র, পৌত্র, ধন জন কিছুরই অভাব থাকেনি মাসিমার। সে মুড়ি খাওয়া এখন উঠে গেছে। এখন সংসারে দৈনিক পাঁচ সাত সের দুধ খরচ হয়। নাতনিদের এক খেপে গাড়ি করে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর কর্তাকে কোর্টে পৌঁছে দেয়। মেসোমশাই গরমের ছুটিতে মাসিমাকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। সংসার জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। চারিদিকে সাফল্য, চারিদিকে সাচ্ছল্য ! পাড়ার পাঁচ-দশজন রোজ এসে কুশল প্রশ্ন করে যায়। দেশের দশ-বিশটা ব্যাপারে মেসো-মশাই-এর ডাক পড়ে। কত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে দাতব্য করতে হয়। সময় পায় না মেসোমশাই সব জায়গায় যেতে।

তবু ক'জন আমায় পীড়াপীড়ি করছিল ক'দিন ধরে, মেসোমশাইকে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে বলবার জন্যে। আমিও মাসি-মাকে দিয়ে বলাবো ভাবছিলাম।

মাসিমা শুনে বললে, 'ও-মানুষকে তো চিরটা কাল দেখে আসছি, বিয়ে হওয়া এস্তোক আমাকে জ্বালিয়েছে। ওঁকে দিয়ে তোদের কাজের কী সুসার হবে বলতো ?'

মাসিমা সত্যিই হেসে বাঁচে না।

বলে, 'ওঁকে সভাপতি করবে, তবেই হয়েছে—আর লোক পেলি নে রে—'

কথায় কথায় মাসিমা খোঁটা দেয়, 'ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, জিগ্যেস করো না ওকে, ওদের তো তিনজনের সংসার, এখন না-হয় ওর বউ ছেলে-মেয়ে হয়েছে, কিন্তু ওর মা কোন্ দিন সংসারের কোন্ কুটোটা নেড়েছে—বলুক ও।'

কখনও কখনও রেগে বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলে, 'পারব না আমি এত দেখতে, তোমার সংসার তুমি দেখ, আমি পারব না। বিয়ে হয়ে এ-বাড়িতে ঢোকা ওব্দি এক দণ্ডও ফুরসুত পেলাম না মা—। কেন, কী আমার

দায় পড়েছে। হোক্‌গে সব লণ্ড-ভণ্ড, তুমি নিজে দেখতে পারো ভালো, নইলে রইলো সব পড়ে—সব অপচো-নষ্ট হোক্‌, আমি ফিরেও দেখবো না আর।'

বলে মাসিমা নিজের শোবার ঘরে বিছানায় উঠে গিয়ে বসে।

বড় বউমা লোক ভালো। মন-রাখা কথা বলতে জানে।

বলে, 'মা, আপনি এখানে বসে থাকলে কেমন করে কী করবো, আমরা ছেলেমানুষ, কী বুঝি—আপনি সামনে বসে দেখিয়ে দিন, আমরা শিখে নি।'

মাসিমা বলে, 'কেন, উনি কোথায়, তোমার শ্বশুর—'

'তিনি তো বাইরের ঘরে।'

'ডাক তাঁকে, ডেকে আনো, দেখুন না এসে সংসারে হুজ্জুতটা কত!'

'তা কি আর কেউ জানে না মা, সবাই জানে, আপনি তবু একবার চলুন নিচেয়।'

'না, তুমি যাও বউমা, আমি যাবো না, একদিন ও-মানুষ দেখুক কাজটা কী হয় সংসারে, বাইরে বাইরে শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান তো নয়, তোমার শ্বশুরের কথা বলছি, সারা জীবনটা আমার এমনি করে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছে বউমা, একটা দিনের তরে শান্তি পাইনি আমি, এমন অকম্মা লোকের হাতে পড়েছিলুম মা!'

বলতে বলতে মাসিমার চোখ সত্যিই ছলছল করে ওঠে।

সাধারণতঃ মাসিমা কাক-কোকিল ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে ওঠে। সেই সুরু হয় চরকির মতো পাক খাওয়া। কে কী খাবে, কোথায় অপচয় হচ্ছে, কার কী প্রয়োজন, সমস্ত জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। যেখানকার যে-জিনিস সেখানে না থাকলেই অনর্থ। রান্নাঘরের পাশে উঠোনের ঝাঁটাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মাসিমা সৌরভীকে ডেকে দু'কথা শুনিয়ে দেবে, 'হ্যাঁ গা মেয়ে, উঠোনের ঝাঁটাটা যে বড় কাত হয়ে পড়ে আছে, এ কেমন ধারা অনাছিষ্টি কাজ গা—সবাই কি বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে!'

এদানি মাসিমা পুজোর সময় প্রতি বছরেই একটা-না-একটা গয়না গড়াত। বউদের যা হবার তা তো হয়ই। সেবার কাজের ভিড়ে স্যাকরাও

সময়মত জিনিসটা গড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। বার বার লোক দিয়ে তাগাদা দিয়েও মহালয়া পেরিয়ে গেল।

মাসিমা সেদিন একেবারে মেসোমশাই-এর সদরে গিয়ে হাজির! মেসোমশাই কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মাসিমাকে দেখে অবাক্। মেসোমশাই মুখ তুলে চাইতেই মাসিমা বললে, 'বলি, তোমাকে তো বলা বৃথা,—তুমি তো তোমার রাজকাজ্য নিয়েই ব্যস্ত!

'কি' হল কী?'

'বলি, সংসারে তো তুমিও একজন, না তুমি সংসার ছাড়া? সংসারে থাকতে গেলেই দু'চার কথা বলতে হয় তাই বলি, নইলে আমার আর কী? যে দিন মরে যাবো, দু'চক্ষু বুঁজবো, সেদিন তোমাকে বলতে আসবো না—তুমিও নিশ্চিন্তে রাজকাজ্য করবে। তা ভেবো না, তোমাকে আমি দুষছি; দোষ তোমরাও নয়, দোষ আমারই পোড়া কপালের। তা নইলে এত লোক থাকতে তোমার মত অকম্মা লোকের হাতেই আমায় পড়তে হয়—'

মেসোমশাই কিছু বুঝতে না পেরে বললে, 'কী, হল কী বুঝতে পারছিনে তো।'

মাসিমা বললে, 'হ্যাঁ গা, আমার কপালেই কি যত অকম্মা জুটতে হয়! চাকর, ঝি, বউদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তারা না হয় কেউ আপনার জন নয়, কিন্তু গয়লা, স্যাকরা এদেরও কী বেছে বেছে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে জ্বালিয়ে খাবার জন্যে?'

সেদিন গয়লা এলে তাকে সোজা শুনিয়ে দিলে মাসিমা, 'তোকে আর দুধ দিতে হবে না বাছা, কত্তার রক্ত জল করা পয়সা, আর তুই এমনি করে ঠকাবি! কত্তা না হয় মানুষ নয়, তা আমরাও কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি?'

কতদিন ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী আমাদের সকলের সামনে মাসিমা দুঃখ করে মেসোমশাইকে বলেছে, 'তোমার হাত থেকে যে কবে নিষ্কৃতি পাবো কে জানে, আর জন্মে কত পাপই করেছি!'

মাসিমা বলত, 'সেই এগারো বছর বয়েসে বউ হয়ে ঢুকেছি এ-বাড়িতে আর এখন বুড়ী হয়ে গেলুম, সুখ যে কী দ্রব্য তা জানলুম না এ-জীবনে।'

মা বাবাকে বলত, 'পড়তে তুমি দিদির হাতে তো বুঝতে ঠেলা, অমন দেবতার মতো স্বামী, তা-ও উঠতে-বসতে গঞ্জনা!'

বাবা বলত, 'তোমার দিদি বুঝবে মজা একদিন—কর্তার মারা যাওয়ার পর ছেলেরা কী করে দেখো।'

আমাদের জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে আসছি মাসিমাকে ওই একইরকম। আগে যখন মেসোমশাই-এর অবস্থা খারাপ ছিল তখনও অভিযোগের অন্ত ছিল না। তারপর সংসারী মানুষের যা কিছু কাম্য, কিছু আর পেতে বাকি ছিল না মাসিমার। ঐশ্বর্য, সম্পদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, পরিজন, দাসদাসী। তারপর ভবানীপুরের প্রাসাদতুল্য বাড়ি। মেসোমশাই-এর বাড়ি নয় তো—রাজপ্রাসাদ। সমস্তই মেসোমশাই-এর নিজের চেষ্টায়, নিজের সৎ উপার্জনে। জীবনে কারো ক্ষতি করেনি। কারো ওপর হিংসা, নয়। দূরের কাছের যে-কেউ আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে এসেছে, আদর এবং অভ্যর্থনা পেয়েছে, বাড়ির একজনের মতো থেকেছে। দিনে দিনে পরিজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ-সমস্তর মূলে একজনের অক্লান্ত অধ্যবসায় পরিশ্রম আর মানুষের সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করবার ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সমাজে মেসোমশাই-এর প্রতিষ্ঠা বেড়েছে দিন দিন, কোর্টে পসার বৃদ্ধি পেয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে। সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে একদিন। কিন্তু যখন দিন গেলে পাঁচ টাকা এনে মাসিমার হাতে তুলে দিয়েছে তখনও যা, যেদিন পাঁচ হাজার এনে তুলে দিয়েছে সেদিও তাই। সে-টাকায় সংসারেরই শুধু সমৃদ্ধি হয়েছে, ছেলে-মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার বেড়েছে, কিন্তু মেসোমশাই-এর পরিশ্রমেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি; মাসিমার কাছে কোনোদিন কোনো মর্যাদারও তারতম্য হয়নি; মাসিমা ছেলেমেয়েদের খাওয়ার তদারক যতখানি করেছে ততখানি করেনি মেসোমশাই-এর।

মাসিমা সন্ধ্যে হতেই হুকুম দিয়েছে খোকাবাবু আজ লুচি খাবে, মনে থাকে যেন ঠাকুর; আর মণ্টুর মাছের তরকারিতে যেন ঝাল দিয়ে বোসো না।

ঠাকুর হয়ত বলেছে, 'বাবুর খাবারটা আগে দিয়ে দেব, মা ?'

মাসিমা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছে, 'বাবুর খাবার পরে হবে, খোকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লে আর খেতে চায় না, জানো না ?'

বড়ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত বহু লোকজন এসে খেয়ে দেয়ে গেল। হাজার লোকের খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। রাত তখন বারোটা। সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে যাবার আয়োজন করছে। হঠাৎ কে যেন বললে, 'বড়-বাবু তো কই খান্‌নি।'

খবর পেয়ে সবাই লজ্জিত সঙ্কুচিত।

মাসিমা খাবার ঘরের সামনে এসে অত লোকের সামনে বললে, 'হ্যাঁ গা, তোমায় অকম্মা বলি কি সাধে, খেতে ভুলে গেলে কী বলে তুমি ? এইটুকু উপকার তোমায় দিয়ে হয় না, আমার কি একটা কাজ, আমি একলা মানুষ কত দিকে নজর দেব ?'

কত জায়গায় একে একে বদলি হল মেসোমশাই। মেসোমশাই-এর কোর্টে যাবার কথা কিন্তু কারো মনে থাকে না সচরাচর। ঠিক সময়ে খাবার দেওয়ার কথাও কেউ ভাবে না। ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে এসে মেসো-মশাই দেখে খাবারের কোনও আয়োজন হয়নি।

মাসিমা এসে হাজির হয়। বলে, 'যখন একলা এই শরীরে সংসার ঠেলেছি, তখন তো কই ভাত দিতে কখনও দেরি হয়নি, এখন কেন হয় ?'

মেসোমশাই বলে, 'কেন হয় তা তুমিই জানো।'

মাসিমা বলে, 'আমার জানতে বয়ে গেছে, তুমিই দেখ, গাদা গাদা লোক রেখেছ, বোঝ এখন যে আমার মত গিন্নী পেয়েছিলে বলেই তুমি এ-যাত্রা টিঁকে গেলে। তুমি কি ভেবেছ চিরটা কাল তোমার সংসারে বাঁদিগিরি করবো বলেই জন্মেছি, আমার আর নিজের সুখ-আহ্লাদ বলে কিছু নেই ? পারবো না আমি দেখতে তোমার ভূতের সংসার, তুমি থাকো তোমার সংসার নিয়ে, আমি পারব না ! যতদিন গতর ছিল দেখেছিলাম, আর নয়, ঢের হয়েছে সংসার করার সাধ আমার খুব মিটে গেছে—।'

সংসারে শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে মাসিমারও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে দেখতাম।

মাসিমাকে দেখলেও আর চিনতে না পারার কথা। নাতি-নাতনী, পুত্র-পৌত্র, পুত্রবধূদের ঘিরে বিকেলবেলা মাসিমা যখন বারান্দায় বসে, তখন সে এক দৃশ্য। এক বউমা মাসিমার চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর একজন সামনে বসে তরকারি কুটছে শাশুড়ীকে জিগ্যেস করে করে।

'মন্টুর কপির তরকারিতে গরমমসলা দিতে বারণ করো ছোট বউমা।'

'খুকুর বাটিতে আজ যেন দুধ রেখো না, কদিন থেকে পেটের অসুখ করেছে, তোমরা তো কেউ দেখবে না—'

'ভোলা আজ লুচি খাবে না বলেছে, ওর জন্যে তিজেল হাঁড়িতে এক মুঠো ভাত করে দিয়ো।'

'পল্টুর দুধটা একটু ঘন করবে ঠাকুর, পাতলা দুধ খেতে পারে না ও, জানো তো।'

এমনি তদারক চলে মাসিমার সারা দিন ধরে।

হঠাৎ হয়ত কেউ বললে, 'মা, কর্তাবাবু কোর্টে চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।'

মাসিমা বলে, 'জানিনে বাপু, সারাদিন কোন্ রাজকাজ্য করেন ভগবান জানে। আমার শতেক কাজ, এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কর্তার চাবির কথা সে-ও আমাকেই ভাবতে হবে, পারব না আমি অত। সংসারের একটা কুটো নেড়ে তো ও-মানুষের উপ্‌গার নেই, বাইরে বাইরে কেবল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন। পারব না আমি, যার যা খুশি করুক, খবরদার, আমাকে কেউ কিছু বলতে আসিসনি, ভালো হবে না।'

তা এমনি করে মাসিমার দাম্পত্য-জীবন কত বছর চলতো কে জানে। সংসার তখন জম-জমাট। মেসোমশাই প্রতিষ্ঠার সুউচ্চ শিখরে উঠেছে। মাসিমারও চুল পেকে গেছে। সম্পদ আর ঐশ্বর্যের সীমা নেই। এমন সময় মেসোমশাই হঠাৎ রোগে পড়ল। ভীষণ রোগ। সকালবেলা কল-ঘরে গিয়ে কী যে হল আর বেরোয় না। শেষে জানা গেল কপালের শিরা

ছিঁড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন যে-যেখানে আছে সবাই ছুটে গেল।

মাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও ছুটে গেলাম খবর পেয়ে।

সমস্ত বাড়িতেই একটা থমথমে ভাব। ঝি-চাকর, নাতি-নাতনী সবাই সন্ত্রস্ত। শুনলাম মাসিমা সেই যে মেসোমশাই-এর পাশে গিয়ে বসেছে আজ দু'দিন, আর ওঠেনি। নাওয়া খাওয়া নেই। কারো কথা শুনবে না। সবাই বলে বলে হার মেনেছে।

মাকে দেখে মাসিমা উঠে এল। চোখে জল নেই। শুকনো খট্‌খটে। রাগে যেন চোখ দু'টো শুধু লাল জবাফুল হয়ে আছে। বললে, 'এসেছিস্ তুই, দেখে যা ও-মানুষের কাণ্ড, সংসারের একটা উপ্‌গার করা দূরে থাক, এই অসুখে পড়ে আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে খাচ্ছেন। ও-মানুষ কি সোজা মানুষ ভেবেছিস, আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে এখন পালাবার মতলব ওঁর।'

মা বললে, 'রাঙাদি, তুমি নিজের শরীরটার দিকে একবার চেয়ে দেখ।'

মাসিমা বললে, 'আমার নিজের শরীরের কথা ভাবব, তাহলে যে আমার সুখ হবে রে—। আমার সুখ দেখলে ও-মানুষের বরাবর পিত্তি জ্বলে যায়, আমার হবে সুখ, বিয়ে হওয়া এস্তোক চিরটা কাল আমায় জ্বালিয়েছে ও-মানুষ। সুখ বলে কী দ্রব্য জীবনে জানতে পারিনি—সুখের আমার হয়েছে কী বোন, সারাটা জীবন আমায় জ্বালিয়েছেন, এখন মরে গিয়ে পর্যন্ত আমায় জ্বালাবার মতলব ওর—উনি কি সোজা মানুষ ভেবেছিস?'

মাসিমার শেষ জীবনটাও আমরা দেখেছি। মেসোমশাই মারা যাবার আগে তার যাবতীয় সম্পত্তি মাসিমার নামে লিখে দিয়েছিল। ভবানীপুরের বিরাট বাড়ি। নগদে আর স্থাবর অস্থাবরে মিলিয়ে প্রায় সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি। ছেলেদের আগেই মানুষ করে গিয়েছিল মেসোমশাই। সব মেয়েদের বিয়েও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কোথাও কোনও ত্রুটি নেই।

মাসিমা বলত, মরণ আমার, সারাজীবন এক দণ্ড সুখ দেয়নি সে-মানুষ, ওঁর সম্পত্তি নিয়ে আমি রাজা হব, দেখিস, আমি ওর সম্পত্তির

একটা পয়সা ছুঁচ্ছিনে হাত দিয়ে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাকুক, ছেলেরা থাকতে কর্তার পয়সায় আমার দরকার নেই মা, আমি কর্তার পয়সার কখনও পিত্যেশ্ করিনি, আর করবও না।'

তা সত্যিই, মাসিমা মেসোমশাই-এর পয়সার প্রত্যাশা করেনি।

আমাদের দেশে যখন যাই, বড় হাসপাতালটার দিকে চেয়ে আমার সব কথা মনে পড়ে যায়, মেসোমশাই-এর নামেই হাসপাতাল। মেসোমশাই-এর সেই প্রাসাদতুল্য বাড়িটা মায় সমস্ত সাত লাখ টাকার সম্পত্তি, সব মাসিমা দান করে গিয়েছিল। শেষ জীবনটা ছেলেদের ছোট বাড়িতে কেটেছে তার। অতবড় বাড়িতে ওই ঐশ্বর্যের মধ্যে এতদিন কাটিয়েও এখানে কোনও অসুবিধে হত না।

মেসোমশাই-এর নামে হাসপাতাল যেদিন প্রতিষ্ঠা হল সেদিনও মাসিমা একবার দেখতে গেল না। যাঁর টাকা তাঁরই নামে হাসপাতাল। প্রকাণ্ড মিটিং হল। মেসোমশাই-এর গুণকীর্তন করে কত লোক কত কী বক্তৃতা দিলে। সামান্য অবস্থা থেকে কেমন করে ধনী হয়েছিলেন সেই ইতিহাস। এতটুকু অহঙ্কার ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না। অনলস কর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। কর্মই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান নিদিধ্যাসন। জীবনে এক মুহূর্তের জন্যে তিনি অলস হননি। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কর্ম-সাধনায় কেটেছে। তিনি কর্মপ্রাণ, কর্মপ্রতীক, কর্মবীর মানুষ। শেষে তাঁর বিধবা স্ত্রীর দানশীলতা ও অচলা পতিভক্তির জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েও একটা প্রস্তাব পাঠ করা হল সভায়। আদর্শ হিন্দু রমণী হিসেবে মাসিমার নামও লেখা রইল হাসপাতালের খাতায়।

তবু হাসপাতালটার দিকে চাইলেই আমার কেবল মনে পড়ত মাসিমার কথাগুলো, 'সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে রে সে-মানুষ, আর তাঁর টাকা ছোঁবো আমি, ওই অকম্মা লোকের হাতে পড়ে আমার সারাজীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাক, তাদের খুদকুঁড়ো যা জোটে তা-ই খাবো, তবু সে-মানুষের টাকা আমি ছুঁচ্ছিনে, দেখে নিস তুই—'

চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবন আর একুশ বছরের বিধবাজীবন—এই এতদিনের একনিষ্ঠ পতিনিন্দার পরে যথারীতি একদিন সকালে মাসিমার মৃত্যুর খবর শুনে চম্‌কেও উঠেছিলাম মনে আছে।

মনে আছে এ-সব ছোটবেলাকার ঘটনা। এর পরে কত রকম রকম-ফের হয়েছে সমাজ-জীবনে। যে-সব মেয়েরা বরাবর বিয়ে করে সংসার করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, তারাই এসে দলে দলে সরকারী অফিসে ঢুকেছে একদিন। নানারকম পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে। মেয়েরা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। জাস্টিস চৌধুরীর মেয়ে লোক-নৃত্য দেখিয়েছে স্টেজে উঠে। যারা কখনও মোটর ছাড়া চলেনি, দাঙ্গার সময় তারাই এসে নারী-কর্মী-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। দল বেঁধে মিছিল করে চৌরঙ্গী দিয়ে লাল-নিশান উড়িয়ে চলেছে। সে আর এক জগৎ, আর এক অধ্যায়। আমার 'কন্যাপক্ষ'তে একবার তাদের কথা বলা হল না। আর তাদের ক'জনকেই বা দেখেছি এক মিলি মল্লিক ছাড়া। সব পাড়াতেই যেমন এক-একটা বাড়ি থাকে, যেখানে একটা-ত্নটো মেয়ের জন্যে পঞ্চাশটা ছেলের জটলা। আর মিলি মল্লিক নিজে না বললে, আমি-ই কি তার সেই অতীত পরিচয় জানতাম, না উষাপতিই জানতো। অমরেশের আখড়ায় উষাপতিও ছিল একজন পাণ্ডা। কিন্তু সে-কথা পরে বলবো।

আর সে-সময়ে আমিই কি কলকাতায় ছিলাম! লেখাই তো ছেড়ে দিয়েছিলাম বছর দশেক। সোনাদির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে লেখা আর ছাপাবো না। লিখবো, পড়বো, সাধনা করবো কিন্তু ছাপিয়ে নাম কলঙ্কিত করবো না। দশ বছর পড়ে তখন যদি সোনাদি অনুমতি দেয় তো ছাপাবো আবার।

সোনাদি বলেছিল, 'মহাভারতের পাণ্ডবদের মতো এই দশটা বছর তোর উদ্যোগপর্ব ধরে নে, এই দশটা বছর তোর অজ্ঞাতবাসের পালা মনে কর।'

সোনাদির সামনে বসে বলেছিলাম, 'তাই হবে সোনাদি!'

তারপর বলেছিলাম, 'কিন্তু বন্ধুরা যে অনেক বই লিখে ফেলবে তত-দিনে ?'

'তা লিখুক, কিন্তু শেষে যদি একখানা তেমন বই লিখতে পারিস, তো সকলকে যে টপ্‌কে যাবি তুই আবার।'

যা হোক, সেদিনের সে-প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছিলাম বৈকি। কিন্তু সেই দশ বছরে এমন কাণ্ড হবে কে জানতো ! এমন করে সব উল্টে-পাল্টে যাবে। এমন করে নিজের জীবন দিয়ে সোনাদি লিখতে শিখিয়ে যাবে আমাকে। বন্ধুবান্ধবরা লেখা চাইতো কাগজের জন্যে। যারা মুখে কখনও প্রশংসা করেনি আগে, লেখা বন্ধ করবার পর তারা কিন্তু বলতো 'খাসা মিষ্টি হাত ছিল আপনার।'

একদিন সোনাদি বললে, 'এবার থেকে তোর সঙ্গে দেখা হবে না আর।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কেন ?'

'এখানে তো অনেকদিন হয়ে গেল, এবার জব্বলপুরে যাবো।'

'কিন্তু তোমার অসুখ যে সারেনি।'

দাশসাহেবও সেদিন সেই কথাই বললেন, 'তুমি চলে যাবে বলছো, কিন্তু শরীরটা তোমার এখনো যে সারেনি।'

সোনাদি বললে, 'আমি ঠিকই আছি, কিন্তু তুমি যেন আবার অত্যাচার সুরু কোরো না—তোমার যা সহ্য হয় না, সেই সব জিনিস খেতেই তোমার লোভ কেবল।'

দাশসাহেব বললেন, 'বলা তোমাকে বৃথা, আর ধরে রাখবোই বা কোন্ অধিকারে ? কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি—সংসারে কোনও কিছুর ওপরেই কি তোমার মায়া নেই ? আমার কথা বলবো না, আমি কেউই নই তোমার, নেহাত ছেলে-মেয়েদের পাল্লায় পড়ে একদিন এসে পড়েছিলে তাই, কিন্তু সত্যই কি এ-বাড়ির ওপরেও তোমার কোনও টান হয়নি ? রতি আর শিশুকে কি একেবারেই ভুলে যেতে পারবে ! তারা গরমের ছুটিতে বাড়িতে এলে তাদের কী বোঝাবো ?'

সোনাদি শুধু হাসতে লাগলো।

দাশসাহেব তবু হাল ছাড়লেন না। বললেন, 'তোমাকে বলতেই হবে সোনা, পৃথিবীতে এমন কেউ-ই কি নেই যে গর্ব করে বলতে পারে তোমাকে কাছে পেয়েছে? যাকে ছেড়ে চলে যেতে তোমার এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়বে চোখ বেয়ে?'

সোনাদি হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি আজ হঠাৎ এমন করে কথা বলছো যে?'

দাশসাহেব বললেন, 'বলিনি, সে শুধু সাহস হয়নি বলে, কিন্তু কত যে আশ্চর্য লেগেছে আমার! স্বামীনাথবাবু তোমার চিঠি না পেয়ে কিছু করেন না, তাঁর সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমার উপদেশ অনুযায়ী চলে, তাঁর বাড়ির নতুন ঝি-চাকর বহাল হয় বরখাস্ত হয় সে-ও তোমার চিঠির মারফত, তুমি চলে আসো এক কথায় নিজের সংসার ছেড়ে আর একজনের সংসারে। আবার হয়ত একদিন আর একটা অনাত্মীয় সংসারে তুমি এমনি করেই জড়িয়ে পড়বে। এ কেমন তোমার নিয়ম! যেদিন জব্বলপুর থেকে চলে আসি, তুমি চলে এলে আমার সঙ্গে, মনে মনে ভেবেছিলাম বুঝি জিত হল আমার, কিন্তু আমার অন্তরাত্মাই জানে কেবল যে সে আমার কতবড় ভুল!'

সোনাদি তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে ছিল আর হাসছিল।

দাশসাহেব আবার বললেন, 'আর অবাক্ লাগে স্বামীনাথবাবুকে। কোনো অভিযোগ কোনো অনুযোগও কি করতে নেই সে-মানুষটির, রক্ত-মাংসের মানুষ এমন করে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেন কেমন করে বলতে পারো?'

সোনাদি হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি সাহেব মানুষ, তোমার হঠাৎ এ-ভাবান্তর কেন বলো তো?'

'এ তোমার উত্তর এড়িয়ে যাওয়া, সোনা।'

এমনি করে উত্তর এড়িয়েই গেছে সোনাদি বরাবর। আমি পাশে বসে শুনেছি। নেহাত ছোট ছেলে বলে কখনও কেউ আমার উপস্থিতিতে

আপত্তি করেনি। আর দাশসাহেব তো আমাকে আমলই দিতেন না। আমি এসব কথা চুপ করেই বরাবর শুনে গেছি। আর দরকার হলে শুধু খাতায় টুকে রেখেছি তু-একটা টুকিটাকি কথা।

মনে আছে তখন সব তোড়জোড় হয়ে গেছে। জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা প্রস্তুত। সোনাদি ইজি-চেয়ারে বসে তদারক করছে। দাশসাহেব অফিসে। অভিলাষ বাক্স গুছিয়ে রাখছে। সোনাদি চলে যাবে, মনটা কেমন খারাপ লাগলো।

সোনাদি বলছিল, 'সারাজীবন কত লোককে হারাবি, কত লোককে পাবি, কত লোক ভালবাসবে, কত লোক আবার আঘাত, দেবে—এই হারানো, এই পাওয়া, এই ভালবাসা, এই আঘাত, এই নিয়েই তো জীবন ; এই সব দেখেই তো একদিন প্রজ্ঞা আসবে, তবেই তো লেখক হতে পারবি তবেই তো···

এমনি সময়েই সেই লোকটা এসে হাজির।

গেট্-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'কাকে চাই ?'

'একটা চিঠি এনেছি স্বামীনাথবাবুর কাছ থেকে।'

লোকটা চলে গেল। চিঠিটা পড়ে সোনাদি কী যেন ভাবতে লাগলো খানিকক্ষণ। তারপর টেলিফোন তুলে দাশসাহেবের সঙ্গে অফিসে কথা বলতে লাগলো।

সোনাদি বললে, 'তোমার গাড়িটা এখুনি পাঠিয়ে দাও, আমি একবার বৌবাজারে যাবো...না, কখন আসবো কিছু ঠিক নেই।...তোমার খাবার খেয়ে নিয়ে শুয়ে প'ড়ো,...আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় যাবে সোনাদি ?'

'চল্, তুইও আমার সঙ্গে যাবি।'

মনে আছে তখনও জানি না কোথায় যাবে সোনাদি। স্বামীনাথবাবু কোথা থেকে চিঠি পাঠাচ্ছেন, কেন পাঠাচ্ছেন, কী লেখা আছে চিঠিতে, তা-ও দেখতে পাইনি। যখন গাড়ি নিয়ে সোনাদি বৌবাজারের এক গলির ভেতর নামলো তখনও জানি না। নম্বর খুঁজে পেয়ে সোনাদি কড়া নাড়তে

লাগলো। কড়া না-নাড়লেও চলতো। একটু ঠেলতেই দরজা ফাঁক হল সামান্য, আর দেখা গেল একজন বুড়োমানুষ সামনের রান্নাঘরে যেন রান্না করছেন।

সোনাদির পেছন-পেছন আমি ঢুকলাম ভেতরে। সোনাদিকে দেখে বুড়োমানুষটি যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এক নিমেষে। বললেন, 'তুমি !'

সোনাদি বললে, 'পুঁটু এখন কেমন আছে ?'

'সেই রকমই, কিন্তু...'

কী জানি কেন আমার যেন মনে হল ইনিই স্বামীনাথবাবু। হঠাৎ তার হাতের দিকে নজর পড়তেই সোনাদি বললে, 'হাত পুড়িয়েছ দেখতে পাচ্ছি। কী দিয়েছ ?'

'নারকোল তেল, কিন্তু...'

'সরো তুমি, একটু চাল-ডাল ফুটিয়ে নেবে তা-ও পারো না, তা পুঁটুর অসুখ হল আর আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারলে না !'

'সময় পেলাম কই ? শিমুলতলায় এসেছিলাম ওকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে আর হঠাৎ একদিন এই কাণ্ড, তাড়াতাড়ি এখানে এনে হাসপাতালে তুললুম, তারপর...'

'এতদিন কী করছিলে, দিন পাঁচেক হল তো এসেছো ?'

'কেবল হাসপাতাল আর ঘর করি, আর নিজের ভাতটা ফুটিয়ে নিই !'

'নিজের ভাতটা যা ফোটাচ্ছ তা-তো দেখতে পাচ্ছি, হাত তো পুড়িয়ে ফেলেছ, ঝি-চাকর কাউকেই তো আনোনি দেখছি, তোমার মতলব কী বলো তো ?'

স্বামীনাথবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর সোনাদি সেই সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে বসলো। এ-সোনাদিকে যেন চেনা যায় না ! ভাবা যায় না, একেই দেখেছি দাশসাহেবের পার্টিতে শৌখীন সমাজের চুড়োয়। জাস্টিস চৌধুরী, ব্যারিস্টার ব্যানার্জি আর মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে যেমন অবাধে মিশেছে, তেমনি করে এই বৌবাজারের ছোট বাসা-বাড়ির রান্নাঘরের ভেতরে একাকার হতেও বাধলো না সোনাদির।

স্বামীনাথবাবু এক ফাঁকে বললেন, 'তুমি কেমন আছো ?'

সোনাদি সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে, 'তোমার হাতে আমার সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে তো আমি ভারি আরামে আছি! আমি জব্বলপুরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি আর এদিকে এই কাণ্ড...'

'তুমি যাবে জব্বলপুরে?'

'যাবো না তো চিরকাল থাকতে এসেছি কলকাতায়?'

মনে আছে স্বামীনাথবাবুকে সেই আমার প্রথম দেখা। এতদিন স্বামীনাথবাবুর সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি সোনাদির মুখে সব মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। নির্বাক, নিরহঙ্কারী মানুষটির ঠিক এমনি চেহারাই আশা করেছিলাম। এমনি আপত্তিহীন, অভিযোগহীন আত্মনির্ভরশীল উদার একটি ব্যক্তি। যেন সংসারে কাউকে অবিশ্বাস করতে জানেন না। সমস্ত জগৎ তাঁকে প্রবঞ্চনা করলেও যেন তিনি নিজের আস্থা হারাতে রাজী নন। ধব্‌ধবে রং, খালি গা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, সমস্ত মিলিয়ে মানুষটিকে যেন পরম আপনার বলে মনে হল।

দু'দণ্ডের মধ্যে কী করে যে সোনাদি সব শেষ করলে কে জানে! সোনাদি যে এমন পাকা সংসারী, দাশসাহেবের বাড়িতে তাকে দেখে তো মনে হয়নি।

সোনাদি বললে, 'নাও, হল, এরই জন্যে হাত পুড়িয়ে, পা পুড়িয়ে একাকার একেবারে....'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতেই বেলা গড়িয়ে এল।

সোনাদি বললে, 'বাড়িভাড়া যা হয়েছে, মিটিয়ে দাও। আর জিনিস-পত্তোর তো দেখছি কিছুই আনোনি—'

স্বামীনাথবাবু যেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

সোনাদি বললে, 'টাকা না থাকে আমিই পাঠিয়ে দেব কাল, কিন্তু এখন চলো—'

স্বামীনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার বাড়িতে। তোমাকে রেখে আবার হাস-পাতালে যেতে হবে এখুনি—'

তারপর সোনাদির বাড়িতেই উঠতে হল। শুধু কি স্বামীনাথবাবু! অদ্ভুত মেয়ে সোনাদি! পুঁটু যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সে-ও সেদিন উঠলো ওখানে। দাশসাহেবের বিছানাতেই শোবার ব্যবস্থা হল স্বামীনাথবাবুর। দাশসাহেব বাইরের ছোট ঘরটায় আশ্রয় নিলেন। আর অসুস্থ পুঁটু রইলো সোনাদির ঘরের আলাদা একটা বিছানায়।

এ এক অদ্ভুত সংসার। এ-সংসারের মতো এমন অদ্ভুত দৃশ্য কোথাও আর দেখিনি পরে। পরে যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, ঝি চাকর বাবুর্চি দারোয়ান ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তখনও···কিন্তু সে-কথা পরে বলবো সময়মতো।

তা সেই বাড়িতেই দেখেছি লম্বা খাবার টেবিলে সবাই খেতে বসেছে। ছুটির দিনের দুপুরবেলা। সোনাদি টেবিলটার মাথায় বসে সকলের তদারক করছে। একপাশে স্বামীনাথবাবু বসেছেন আর একপাশে দাশসাহেব। আর ও-পাশে পুঁটু, রতি, শিশু। ইস্কুলের ছুটিতে তারাও বাড়ি এসেছে।

মাঝপথেই রতি হাত গুটিয়ে বসেছে।

সোনাদি বললে, 'তুই কিছু খাচ্ছিসনে কেন রে?'

'পেট-ব্যথা করছে মা!'

দাশসাহেবকে লক্ষ্য করে সোনাদি বললে, 'শুনছো, বাগানের পেয়ারা-গাছের একটা পেয়ারাও রাখেনি ওই তিনটেতে।'

দাশসাহেব খেতে খেতে বললেন, 'তুমি কিছু বলো না কেন?'

স্বামীনাথবাবু মুখ তুলে বললেন, 'আমিও একটা খেয়েছি।'

দাশসাহেব হেসে উঠলেন, 'আপনিও খেয়েছেন নাকি পেয়ারা?'

স্বামীনাথবাবুও হাসলেন, 'হ্যাঁ, দিলে যে ওরা—কাশীর পেয়ারা, খেতে ভালো।'

আমাকে দেখিয়ে দাশসাহেব বললেন, 'ওই পেয়ারাগাছতলায় ওদের কুস্তির আখড়া ছিল, মাটিটা খুব সারালো কিনা, ফল ফলে ভালো।'

স্বামীনাথবাবু আমাকে বললেন, 'তুমি কুস্তি করতে নাকি?'

বললাম, 'তখন করতাম।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'বেশ, তা অভ্যেসটা ছেড়ো না, ওতে শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে।'

সোনাদি একবার বললে, 'তুমি অত খাচ্ছ যে?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'কে আমি? আমাকে বলছ?'

'তুমি না, দাশসাহেবকে বলছি।'

দাশসাহেব মুখ তুললেন, 'আমি?'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই তো বলছি, শেষকালে প্রেসার বেড়েছে বলে যেন কান্নাকাটি কোরো না আবার।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তা তো বটে, আপনার বেশি অত্যাচার করা ভালো নয়, সোনা বলেছে ঠিক।'

দাশসাহেব বললেন, 'মাঝে মাঝে ভুলে গিয়ে বেশি খেয়ে ফেলি—'

সোনাদি বললে, 'রতি-শিশুকে তবু বকলে শোনে, যত বয়েস হচ্ছে, ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো দিন দিন···'

এমনি করে এক সময়ে খাওয়ার পাট চুকতো। তারপর যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তো সবাই। তখন ইজি-চয়ারে চুল এলিয়ে দিয়ে বসতো সোনাদি। আর আমি পাশে বসে-বসে আমার কাজ করতুম। নিজের অভিমান, দুঃখ, আনন্দ সব কিছু জানাবার একমাত্র মানুষ। সোনাদি জিগ্যেস করতো, 'আর ছাপাতে দিসনি তো লেখা?'

বলতাম, 'না সোনাদি।'

'সত্যি কথা?'

'সত্যি, তুমি দেখে নিয়ো, দশ বছর পরে যা লিখবো, দেখবে নতুন জিনিস, সবাইকে চমকে দেব—তখন তোমাকে ভালো বলতেই হবে, দশটা বছর দেখতে দেখতে যাবে...'

কিন্তু আজ ভাবি, সেই দশ বছরে কি কম অদল-বদলটা হল। কোথায় রইল সোনাদি আর কোথায় রইলাম আমি। কোথায় গেলেন স্বামীনাথ-বাবু! আর কোথায়ই বা গেলেন দাশসাহেব! চেষ্টা করলে আজো যেন দেখতে পাই চোখ মেলে।

এর পর আমি কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছি। ঘটনাচক্রে চাকরি নিয়ে বিলাসপুরে গেছি। বন্ধুবান্ধব লেখার জন্যে তাগাদা দিয়েছে। কেউ কেউ না-লেখার জন্যে অভিযোগ করেছে, অনুযোগ করেছে। কিন্তু কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছি বটে, কিন্তু লেখক কি সম্পাদক বন্ধুদের সঙ্গে দেখাও করিনি। পাছে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হয়। পাছে সোনাদির কাছে দেওয়া কথার খেলাপ করতে হয়। সেই দশ বছরে পাঠক সমাজ আমাকে ভুলে গেল। সাহিত্য-জগৎ থেকে আমার নির্বাসন হল বলা চলে। সে দশ বছর আমার জীবনে অজ্ঞাতবাসের পালা। নব-জন্মের উদ্যোগ পর্ব। আমি নতুন করে দেখছি। নতুন করে শিখছি! খণ্ড কল্পনার ছলনায় আর ভুলব না। অখণ্ডকে অনুভব করবো! আমার এই আমি সেই দশ বছরে পরম-আমির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। মনে আছে সেই দশ বছরেই প্রথম জীবনকে নতুন করে দেখার দৃষ্টি পেলাম। আমার তৃতীয় নেত্র খুললো।

আর সোনাদি ?

কিন্তু সোনাদির কথা বলবার আগে পলাশপুরের মিলি মল্লিকের গল্পটা আমি বলে নিই। পরে বলবার আর ফুরসুত পাবো না। মনে আছে সেদিন মিলি মল্লিকের গল্পটা লেখবার লোভ আমি অতি কষ্টে সামলে নিয়েছিলাম। তবু আজ এতদিন পরে আমার নোট খাতা থেকে উদ্ধার করতে আপত্তি নেই। আসলে এটা উষাপতির বৌকে নিয়ে লেখা। আমাদের কুস্তির আখড়ার উষাপতি। অমরেশের মতো উষাপতিও চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। রেলের চাকরি তার। একরাত্রের জন্যে উষাপতির পলাশপুরের রেলকোয়ার্টারে অতিথি হয়েছিলাম। আর সেই রাত্রেই একটা হীরের টুকরো কুড়িয়ে পেলাম আমার শোবার ঘরে।

মাত্র দু'রতি ওজনের এক টুকরো হীরে। তাই নিয়েই একটা গল্প মাথায় এসেছিল। গল্পটা লেখবার আগে উষাপতিকে একটা চিঠি লিখে-ছিলাম তার অনুমতি চেয়ে।

উষাপতি উত্তরে লিখেছিল, 'সতীকে নিয়ে গল্প তুই লিখতে পারিস,

তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দেখিস ভাই, যাতে সতীর কোনো দুর্নাম হয় বা বদনাম হয় আমাদের, এমন কিছু লিখিস নে। জানিস তো, মেয়েমানুষের মন, চট করে এমন কাণ্ড করে বসবে—'

আরো অনেক কথা লিখেছিল। উষাপতি তখন ছিল পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টার। এখন বদলি হয়েছে রায়গড়ে। মাইনেও অনেক বেড়েছে। দু'পয়সা এদিক-ওদিক থেকেও আসে। নিজেও বিশেষ খরচে-স্বভাবের লোক নয়। কিন্তু চিঠির শেষে লিখেছে, তোদের ওখানে যদি ভালো কোনো ডাক্তার থাকে, একটু খবর নিয়ে জানাস, সতীকে চিকিৎসা করাতে চাই। অনেক ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, সাধুকে দেখালাম—খরচও হচ্ছে প্রচুর—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—'

উষাপতির অনুমতি নিয়ে গল্পটা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম বটে। কিন্তু লিখতে গিয়ে হঠাৎ কেমন হাসি এল। সতীকে নিয়েই গল্পটা বটে। উষাপতিকে অবশ্য জানাইনি দু'রতি ওজনের হীরের কথা। জানিয়েছিলাম, সতীই আমার গল্পের নায়িকা। কিন্তু আসলে তো জানি যে, সতী আমার গল্পের উপনায়িকা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। শকুন্তলার যেমন প্রিয়ম্বদা। কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে আমার ঘরে কে এসেছিল ? এ-গল্পের নায়িকা, না উপনায়িকা ?

সত্যি সেই রাতটার মধ্যেও যেন কিছু মোহ ছিল। সেটা বুঝি ফাল্গুনী-পূর্ণিমার রাত। জীবনে কতদিন জীবিকার জন্যে রাতের পর রাত কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। অফিসের চারটে দেওয়ালের মধ্যে কাজ করতে করতে অনেকবার বাইরে চেয়ে দেখেছি। কেমন করে রাতের গাঢ় অন্ধকার পাতলা হয়ে নীল হয়, সেই নীল কেমন করে সাদা হয় তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবু মনে হয়েছে রোজই যেন নতুন দৃশ্য দেখেছি। দশ বছর আগের সেই রাতটা যেন আজো আমার জীবনে অনন্য আর একক হয়ে রয়েছে। পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টারের বাঙলোর সেই সঙ্গীহীন ঘরে সারারাত তো আমার অনিদ্রাতেই কেটেছিল। তবু সকালবেলা জলখাবার খেতে বসে উষাপতি অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার চেহারা দেখে।

বলেছিল, 'রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি ?'

বলেছিলাম, 'না।'

উষাপতি বলেছিল, 'আমারও হয়নি।'

কী জানি কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। বলেছিলাম, 'কেন, তোর হয়নি কেন ?'

উষাপতি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল···

কিন্তু যা বলেছিল, তা বলবার আগে গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটাই বলা দরকার।

উষাপতি তখন সবে বদলি হয়েছে পলাশপুরে। নতুন বিয়ে করে সংসার পেতেছিল ওখানে। ওর অনেকদিনের সাধ ছিল আমাকে ওর বউ দেখায়। চিঠিতে লিখেছিল কতবার। নাকি বেশ নিরিবিলি জায়গা। অন্তত কলকাতার চেয়ে নিশ্চয়ই নিরিবিলি। চার-পাঁচটা কলিয়ারীর সাইডিং শুধু বেরিয়ে গেছে স্টেশন থেকে। কোলিয়ারী ছাড়া স্টেশনের আর কোনো উপযোগিতাও ছিল না। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো আমাকে, 'এবার শীতকালে নিশ্চয়ই আসিস। তোর জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

কিন্তু যাওয়া আর আমার হয়ে ওঠেনি। উষাপতি যখনই ছুটিতে এসেছে, দেখা করেছে আমার সঙ্গে। বলেছে, 'আমার ওখানে গেলি না তো একবার।'

বিশেষ করে, স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে অতিথি হওয়ার একটা লোভও ছিল বরাবর। মুরগি, মাছ, ডিম, ঘি—সবই স্টেশন-মাস্টারের প্রায় বিনা-পয়সায় প্রাপ্য। আকারে-প্রকারে উষাপতি আমাকে জানিয়েও দিয়েছে সে-কথা। কিন্তু নিজের কোটর ছেড়ে নড়া-চড়া করার সুবিধে কখনও হয়ে ওঠেনি বলে যাওয়াও হয়নি ওর কাছে।

কিন্তু সেবার বম্বে যাবার পথে কেমন করে যে কাট্‌নী স্টেশনে হঠাৎ নেমে পড়লাম, তা নিজেই জানি না। কাট্‌নী থেকে কয়েকটা স্টেশন গেলেই পলাশপুর। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন। একটা রাত থাকবো ওখানে, তারপর পরদিন আবার ফিরবো। এই-ই ছিল মতলব।

যখন গিয়ে পলাশপুরে পৌঁছলাম তখন বিকেল।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল উষাপতি। সাদা গলাবন্ধ কোট পরলেও চিনতে কষ্ট হল না। আমাকে দেখেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে।

বললাম, 'কিন্তু কালকেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই, ভীষণ কাজ—'

'সে হবে না' বলে কাকে যেন হুকুম দিলে আমার মালপত্তোর বাড়িতে নিয়ে যেতে।

তা পলাশপুর বেশ বড় স্টেশন। সব গাড়ি জল নেয় এখানে। বাইরে বিরাট একটা খেলার মাঠ। জাফরি-দেওয়া বড় বড় বাঙলো। রাস্তায় ফিরিঙ্গী সাহেব-মেমদের ভিড়। সাইকেল-রিক্‌শা'র চল্ আছে বেশ এদিকে। বিকেলবেলার গাড়ি দেখতে প্ল্যাটফরমে টাউনের লোক এসে জুটেছে। গাড়ি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব চলে গেল প্ল্যাটফরম থেকে। ফাঁকা স্টেশন।

উষাপতির হাজার কাজ। দশজনকে হুকুম দিতে হয়। দশজনকে শাসন করতে হয়।

কাজের ফাঁকে একবার বললে, 'আর একটু বোস, একসঙ্গে যাবো বাড়িতে—আর এই কাজটা সেরে নি।'

শেষ পর্যন্ত একসময় কাজ সেরে উঠলো উষাপতি। বললে, 'আর পারিনে কাজের ঠেলায়। এই দেখ না, তুই এলি, তোর সঙ্গে একটু ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না—যা হোক, তারপর কাল কিন্তু তোর যাওয়া হবে না বলে রাখছি—ওসব ওজর আপত্তি শুনছিনে।'

বললাম, 'তা হয় না রে। ওদিকে একদিন দেরি হলে ভারি অসুবিধে হবে আবার—'

'সে কৈফিয়ত দিস তুই মিলির কাছে, তার হাতে তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি খালাস, ভাই—বাড়ির ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ কি আমার এলাকার বাইরে চলে গেলে—সেখানে মিলির কথাই ফাইন্যাল।'

বললাম, 'পুরোপুরি ডিভিসান-অব-লেবার দেখছি।'

উষাপতি সিগ্রেটে টান দিতে দিতে বললে, 'না করে উপায় ছিল না, ভাই। আমার অফিসের এত কাজ যে, এর পরে আর বাড়ির কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার ফুরসুত পাই না, ওটা মিলি নিজেই ঘাড়ে নিয়েছে, বলেছে,—বাড়ির ব্যাপারে আমায় সম্পূর্ণ স্বরাজ দিতে হবে। তা এমন কি, ওর চিঠি পর্যন্ত আমি খুলে পড়তে পারবো না, ও-ও আমার চিঠিপত্র খুলবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'এই যে তুই এলি, কী খাবি না-খাবি,—সমস্ত ভাবনা তার। কোথায় শুবি, কী করবি—ও নিয়ে আমায় আর মাথা ঘামাতে দেবে না।'

বললাম, 'এরকম স্ত্রী পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা রে।'

উষাপতি হাসলো। বেশ যেন পরিতৃপ্তির হাসি। বললে, 'তা জানিনে। তবে যারা এসেছে বাড়িতে, দেখেছে মিলিকে, তারা বলে,—আমার নাকি স্ত্রীভাগ্য ভালো। তবে বিয়ে তো একটাই করেছি, তুলনামূলক বিচার করতে পারবো না ভাই।'

উষাপতি আবার বলতে লাগলো, 'আমি অবশ্য তোদের অনেক পরে বিয়ে করেছি, বলতে পারিস একটু বুড়ো বয়েসেই। মনে একটা ভয় ছিল বরাবর, এ বয়েসে বিয়ে করে হয়ত আর-একজনকে কষ্ট দেব—কিন্তু'...

'কিন্তু' বলে কথাটা আর শেষ করলো না উষাপতি। আত্মতৃপ্তির এক বাঙ্ময় হাসিতে আবার ভরে উঠলো উষাপতির মুখ। সে-হাসি গোপন করতে চেষ্টা করলো না উষাপতি।

বললাম, 'তাহলে বিয়ে করে খুব সুখী হয়েছিস বল্—বিয়ে করবো না বলে যে রকম পণ করেছিলি তুই—'

উষাপতি আবার হাসলো। বললে, 'সুখী ?...তবে আমি মিলিকে বলেছিলাম বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে, কারণ বরাবর ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে এসেছে—শেষকালে আমাকে না দোষ দেয় যে, তোমার জন্যে আমার ডিগ্রীটা পাওয়া হল না! তা কী বলে জানিস—?'

বললাম, 'কী বলেন ?'

'মিলি বলে…'

কিন্তু মিলি কী যে বলে তা আর বলা হল না। হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একটা বিলিতী টেরিয়ার কুকুর এসে আপ্যায়ন জানাতে লাগলো উষাপতিকে। উষাপতি বললে, 'আরে, তুই ঠিক টের পেয়েছিস দেখছি !'

বললাম, 'তুই আবার কুকুর পুষেছিস নাকি ?'

'আরে আমি পুষতে যাবো কেন ? মিলির। মিলির ছোটবেলাকার কুকুর, বিয়ের পর এ-ও এসেছে সঙ্গে…যাক্‌গে যে-কথা বলছিলাম—' বলে উষাপতি আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল।

গলা নিচু করে হাসতে হাসতে বললে, 'কালকে আমাদের বিয়ের বার্ষিকী গেছে কিনা—খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, কুকুরটা খুব খুশী আছে তাই, তা সেই উপলক্ষে হীরে-বসানো নেকলেস একটা দিয়েছি ভাই মিলিকে—আনিয়েছি কলকাতা থেকে! তুই একবার দেখিস তো—বেটারা ঠকালো, না ঠিক দাম নিয়েছে।'

বললাম, 'কত দাম নিলে ?'

'চোদ্দ শো টাকা নিয়েছে অবশ্য, তা নিক্‌গে, সে জন্যে কিছু নয়। উপ্‌রি পয়সা ওয়াগন পিছু কিছু-কিছু পাওয়া যায়, কোলিয়ারী যদ্দিন আছে ভাই, টাকার অভাবটা নেই তদ্দিন। তারপরে যদি বদলি করে কখনও কোনো খারাপ স্টেশনে তখন দেখা যাবে—'

কথা বলতে বলতে উষাপতির বাঙলোর সামনে এসে গিয়েছিলাম। উষাপতির আভাস পেয়ে বুঝি তার স্ত্রীও এসে দাঁড়ালো সামনে। আমাকে অবশ্য আশাই করছিল। কারণ আমার স্যুটকেস, বিছানা আগেই পৌঁছে গেছে এখানে।

কিন্তু উষাপতির স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন থম্‌কে গেলাম। আমাকে দেখে যেন কালো হয়ে এল তাঁর মুখখানা।

তবে এক মুহূর্তের জন্যে! এমন কিছু নজরে পড়বার মতো নয়।

উষাপতি এগিয়ে গিয়ে বললে, এই দেখো, কাকে এনেছি। আমাদের দলের হীরো এ—আর ইনি—'

আলাপ হল। এবার হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন মিলি দেবী। টেবিলে গিয়ে বসলাম। চায়ের সরঞ্জাম তৈরি ছিল।

চা তুলে নিয়ে উষাপতি বললে, 'কিন্তু ও কী বলছে জানো, ও নাকি কালই চলে যাবে।'

মিলি দেবী হঠাৎ অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইলেন, 'সে কী? তা বললে শুনছি না, কাল আপনার যাওয়া চলবে না।'

উষাপতি বললে, 'এখন তোমার হাতে ভার দিয়ে দিলাম—আমার আর কিছু করবার নেই। যা ভালো বোঝ করো।'

মিলি দেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই নাকি?'

বললাম, 'ক্ষমা করবেন এবার। পরের বার বরং থাকবো যতদিন বলেন, এবারে বিশেষ জরুরী কাজে—'

মিলি দেবী বললেন, 'বাড়িতে যখন আমার এলাকার মধ্যে এসেছেন, তখন আপনাকে দু'দিন থেকে যেতেই হবে···আমরা বিদেশে পড়ে থাকি, একটু বুঝি দয়া-মায়া নেই আপনাদের!'

উষাপতি হাসতে লাগলো।

হাসতে লাগলাম আমিও।

মিলি দেবীও হাসতে লাগলেন।

কথা বলতে বলতে উষাপতি হঠাৎ বললে, 'তোমার নেকলেসটা দাও তো একবার, দেখাই।'

বললাম, 'আমি তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি বেশ—ওঁর গলাতেই তো মানাচ্ছে ভালো। কেন আর—'

উষাপতি বললে, 'না না, তা কি হয়। হারটা খুলে দাও—বেটারা ঠকালো কিনা জেনে নেওয়া ভালো। এ আমাদের ভালো সমঝদার একজন, ওদের ফ্যামিলিতে এ-সব জিনিস আছে অনেক।'

মিলি দেবী নেকলেসটা খুললেন। বেশ চমৎকার জিনিসটা মনে হল।

দেখে মনে হল, ন্যায্য দামই নিয়েছে। নতুন ডিজাইনের জড়োয়ার কাজ করা হার। ঠিক লকেটের ওপর একটা দু'রতির হীরে জ্বলজ্বল করছে।

হারটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'বড় সুন্দর জিনিস—আপনার পছন্দ আছে বৌদি।'

মিলি দেবী খানিক পরে চলে যাবার পর উষাপতি বললে, 'বেশি বয়েসে বিয়ে করলে এই সব গুনোগার দিতে হয় ভাই।'

বললাম, 'কেন? এ কথা বলছিস কেন?'

উষাপতি সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কী একটা কাজে পাশের ঘরে চলে গেল। আমিও এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বড়লোক হয়েছে উষাপতি এখন। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে। শুধু সুন্দরী স্ত্রী নয়, সুশিক্ষিতা বিদূষী বলা চলে। হয়ত উষাপতি নিজের ঐশ্বর্য দেখাতেই আমাকে এতবার আসতে নিমন্ত্রণ করেছিল। তবু খুশি হলাম দেখে যে, তার জীবন সার্থক হয়েছে। বিয়ে করে সুখী হয়েছে সে। বাপ-মা-মরা উষাপতি। বড় গরীব ছিল আমাদের দলের মধ্যে। বরাবর ওর উচ্চাশা, একদিন আমাদের সমান পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এতদিন পরে তা সফল হয়েছে। দেখে আনন্দই হল।

অনেকদিন আগেকার কথা। ভালো করে সব মনে নেই। শুধু মনে আছে বেশ আনন্দে, হাসিতে, গল্পে কেটে গেল সে-সন্ধ্যেটা। আরো মনে আছে বার বার মিলি দেবী কেবল বলেছেন, 'কাল আপনার যাওয়া হবে না তা বলে, আর একটা দিন থাকতেই হবে।'

সেই রাত্রেই ঘটনাটা ঘটলো।

ঠিক কত রাত্রে বলতে পারবো না। নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না। মনে হল ভেজানো দরজাটা খুলে কে যেন ঘরে ঢুকলো। নিস্তব্ধ রাত। শুধু মাঝে মাঝে রেলের ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি আর আক্রোশের গর্জন কানে আসে।

বললাম, 'কে?'

ছায়ামূর্তি বললে, 'আমি—'

বিছানার ওপর সটান উঠে বসেছি। অস্পষ্ট হলেও অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না।

বললাম, 'আপনি! হঠাৎ?'

মিলি দেবী বলে উঠলেন, 'আপনি এখানে আসতে পারেন হঠাৎ, আর আমি আসতে পারি না? এ আমার বাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমি এখানে খুব সুখে ছিলাম—কেন তুমি এলে? বলো, সত্যি কথা বলো—কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

হতচকিত নির্বাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

বললাম, 'কী বলছেন আপনি!'

'চীৎকার করো না, পাশের ঘরে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তুমি ললিতকে বোলো, মিলি তাকে ভুলে গেছে। কাঁসারিপাড়া লেন-এর সে-বাড়িটা সে-ঘরটা আমার আর মনে নেই, আমি এখন মিলি মল্লিক—আমি এখন পরস্ত্রী...'

আবার বললাম, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা বলো না, আমি তোমাদের সবাইকে চিনি। ললিত তোমার ভাগ্নে নয়? বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিক্ করতে আমাদের সঙ্গে যাওনি তুমি? ইণ্টারমিডিয়েট টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ট্যাক্সি করে কারা ঘুরিয়েছিল আমাকে! আমরা গরীব ছিলুম, তাই তোমাদের সাহায্য আমরা তখন নিয়েছি। কিন্তু এখন তো আমি বড়লোকের স্ত্রী! এখন তোমাদের প্রয়োজন আমার মিটে গেছে। এখন শাড়ি দিতে এলেও নেব না, গয়না দিতে এলেও নেব না আমি, সিনেমা দেখাতে এলেও যাবো না তোমাদের সঙ্গে—কেন এসেছ তুমি? একজনকে পাগল করে দিয়েছ বলে ভেবেছ আমাকেও করবে? সত্যি বলো তো, কিছু মনে পড়ছে না?'

ললিত নামে কোনো ভাগ্নে দূরে থাক, ও-নামের কোনো বন্ধুও আমার কোনও কালে ছিল না। কী জানি কী খেয়াল হল, বললাম, 'পড়েছে।'

'ললিত তোমায় পাঠিয়েছে? সত্যি কি না বলো?'

এবারও বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি তোমাদের সকলকে চিনি, জানতাম না আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে—কিন্তু তোমাদের পায়ে পড়ি, আর কখনও এসো না এখানে, যাও, কাল সকালেই চলে যেয়ো এখান থেকে—বুঝলে ?'

বললাম, 'যাবো।'

'হ্যাঁ, তাই যেয়ো।'

শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মিলি দেবী যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

তারপর সমস্ত রাত আমার আর ঘুম এল না। মনে হল—কার ভুল ? আমার, না, মিলি দেবীর ? আর কখনো কোথাও ওকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কে ললিত ! কার ভাগ্নে ! কবে কার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরেছেন। কবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্যাক্সিতে ! আমার চেহারার সঙ্গে কি অন্য কারো চেহারার বা নামের মিল আছে ? নিজের স্মৃতির অলি-গলি-ঘুঁজি সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো কিনারা করতে পারিনি।

ভোরবেলাই বিছানা ছেড়ে উঠেছি।

উষাপতি তারও আগে উঠেছে। চায়ের টেবিলে পোশাক পরে তৈরি সে। এখনি বোধ হয় ডিউটিতে যাবে। পাশে কালকের মতো মিলি দেবীও বসে। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই যেন।

উষাপতি আমাকে দেখেই বললে, 'কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি ? এরকম চেহারা কেন রে ?'

বললাম, 'না, নতুন জায়গা বলে হয়ত।'

উষাপতি বললে, 'আমারও হয়নি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কেন ?'

উষাপতি বললো, 'সতী কাল রাত্রে বড় বিরক্ত করেছে।'

'সতী ! সতী কে ?' জিগ্যেস করলাম।

মিলি দেবী চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'আমার দিদি।'

উষাপতি বললে, 'হ্যাঁ, মিলির দিদি। মাথাটা সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, পাগলের মতো লক্ষণ, আমার এখানেই রয়েছে এখন।'

হঠাৎ যেন কেমন সন্দেহ হল। মিলি দেবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। শান্ত, পরিতৃপ্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কাল রাত্রে তবে কি ভুল দেখেছি! পাগলের প্রলাপ শুনেছি কেবল?

উষাপতি আবার বললে, 'মাঝে মাঝে বেশ থাকে, কাল রাত থেকে আবার হঠাৎ কিরকম মাথাটা বিগড়ে গেছে—সারা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, চীৎকার করেছে, বকেছে—কেঁদেছে—'

উষাপতি আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালে। একটা ঘরের ভেতরে বন্ধ। অবিকল মিলি দেবীর মতো দেখতে। বয়সে দু'এক বছরের ছোট-বড় হয়ত। ঘরের মধ্যে আপন মনেই বিড়বিড় করে বকছে।

উষাপতি বললে, 'এখন ওইরকম কিছুদিন থাকবে, তারপর আবার কিছুদিন ভালো হয়ে যাবে—স্বামী নেয় না, তারপর থেকেই...কিন্তু তুই আজকে থাকছিস তো?'

বললাম, 'না ভাই, আজ পারবো না থাকতে।'

উষাপতি মিলির দিকে চেয়ে বললে, 'ও কী বলছে শোনো—থাকবে না নাকি আজ।'

মিলি দেবী তেমনি স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তা হবে না, থাকতেই হবে কিন্তু—'

চা খেতে খেতে হঠাৎ উষাপতি একবার স্ত্রীর দিকে কৌতূহলী হয়ে যেন কী দেখতে লাগলো। কাছে গিয়ে গলার নেকলেসটা দেখে বললে, 'একি? তোমার লকেটের হীরে কোথায় গেল?'

'কই দেখি? কী সর্বনাশ!'

আমিও দেখলাম।

মিলি দেবীও নেকলেসটা খুলে দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন। তাই তো! কাল সন্ধ্যেবেলাও তো ছিল সেটা! কোথায় গেল একরাত্রের মধ্যে। খোঁজো তো বিছানাটা! বিছানাটা খোঁজা হল। খোঁজা হল ঘর-দোর। এখানে-ওখানে। ব্যস্ত হয়ে পড়লো উষাপতি। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিলি দেবী। কোথাও তো যাওনি? দেখো তো বাথরুমটা! যাবে কোথায়?

হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না। শোবার ঘর, হল ঘর, আর নয়তো বাথরুম!

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! সেদিন কোথাও সেই তু'রতি ওজনের হীরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উষাপতি আর মিলি দেবীর কাছে আজ পর্যন্ত সেটা নিরুদ্দেশ হয়েই আছে হয়ত।

মনে আছে সেদিন কারো অনুরোধ উপরোধ না-শুনেই চলে এসেছিলাম পলাশপুর থেকে।

ফিরে এসে গল্পটা সমস্ত লিখে পাঠিয়েছিলাম উষাপতির কাছে। আপত্তির কিছু আছে কিনা জানতে। উত্তরে উষাপতি লিখেছিল, 'মিলিও তোর গল্পটা মন দিয়ে পড়েছে। বলেছে,—গল্পটা ভালো হয়েছে, কিন্তু যেন অসম্পূর্ণ মনে হল লেখাটা। তু'রতি হীরের কথাটা গল্পের পক্ষে অবান্তর হয়ে গেছে নাকি। গল্পের সঙ্গে ওর যোগাযোগ কী বোঝা গেল না, আমি অবশ্য সাহিত্যের কী-ই বা বুঝি—যা হোক সেই হীরেটা এখনও পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না বোধহয়।'

আজ এক-একবার ভাবি, মিলি দেবীকে চিঠি একটা লিখবো নাকি। লিখবো নাকি হীরেটা আমার কাছেই আছে। জানিয়ে দেব নাকি যে সেদিন ভোরবেলা নিজের বিছানাটা বাঁধবার সময় আমার শোবার ঘরেই সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমি! সেই তু'রতি ওজনের হীরেটা। কিন্তু আবার ভাবি, থাক্ না। উষাপতি স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে। ওদের সংসারে আগুন জ্বেলে লাভ কি! আমার এ গল্প যদি অসম্পূর্ণ থাকে ত থাক —আমি জীবনে আরো অনেক সম্পূর্ণ গল্প লিখতে পারবো, কিন্তু ওরা সুখে থাকুক। আমার একটা সামান্য গল্পের চেয়ে ওদের জীবন যে অনেক দামী।

আজো পলাশপুরের মিলি মল্লিকের গল্পটা আমার নোট-খাতাতেই বন্দী হয়ে আছে। ও আমি লিখিনি। ও আমি লিখবোও না। মিষ্টিদিদি, কালোজামদিদি, মিছরিবৌদি সকলের গল্পের মতো ও আমার জীবনের শুধু সঞ্চয়ই মাত্র হয়ে থাক। ওর চেয়ে মহৎ কিছু লিখবো। মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর

কিছু। ওদের অতিক্রম করে নারীত্বের আরো বড় সত্তাকে দেখবো আমি। নারীর অন্তরাত্মাকে আমি খুঁজবো। আমার নবজন্মের উদ্যোগপর্বে সেই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার দশ বছরের অজ্ঞাতবাস তবেই হবে সার্থক।

বিলাসপুরে চলে যাবার আগে সোনাদিকে আমি সেই কথাই দিয়েছিলাম।

আমার প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি। কিন্তু বিলাসপুরে যাবার আগে আমি কি জানতাম এমন হবে!

মনে আছে বিলাসপুরের সেই জীবন! কোনও কাজ নেই, শুধু চুপ করে দেখা আর শোনা। কেবল ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াই। কখনো জব্বলপুর, কখনো কাট্‌নী, কখনো অনুপ্‌পুর। কত সব অখ্যাত ইস্টেশান। জঙ্গল, পাহাড় আর বিচিত্র সব মানুষ। মনেন্দ্রগড়, চিরিমিরি, নাইনপুর, গণ্ডিয়া, বালাঘাট। অমরকণ্টক রেঞ্জ ধরে রেললাইন চলেছে। পেণ্ড্রা রোড। কখনো চড়ি গার্ড সাহেবের ব্রেকভ্যানে। কখনো আইস-ভেণ্ডারদের থার্ড-ক্লাস কামরায়। আবার দরকার হলে কখনো ফার্স্ট ক্লাস কামরার নির্জনে। সে-এক বিচিত্র চাকরি, বিচিত্র জীবন। নিজেকে বড় নগণ্য মনে হল এই পৃথিবীর ভিড়ে। প্রথম উপলব্ধি হল, পৃথিবীটা শুধু কলকাতাই নয়। এ-পৃথিবী আরো অনেক বড়। এ ম্যাপ দেখে পৃথিবী দেখা নয়। মানুষ যত বড়ই হোক, মনে হল বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতির কাছে সে তুচ্ছ। বড় স্বস্তি পেলাম। নিজের আমাকে আমার মধ্যে খুঁজে পেলাম। সোনাদির কথাই সত্যি মনে হল। সোনাদি বলতো, 'বস্তুকে দেখবিনে, সত্যকে দেখবি। বাচ্ছা পাখির যেমন চোখ ফোটার আগেই আলো দেখবার জন্যে বাসনা হয়, কাকে বলে আলো তা সে জানে না তখনও, তবু তার বোজা চোখের মধ্যেও সেই আলোর সত্যটা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে—তেমনি করেই তোর জীবনে সব দেখা সত্যি হোক।'

সোনাদি আরো বলতো, 'জীবনে সুখ নেই বলে দুঃখ করিস নে। জীবনকে তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি, সমস্ত উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে যেন ভালোবাসতে পারিস এমন শক্তি পাওয়া চাই।'

আরো কত কী কথা কতদিন বলেছে, সব কি আজ মনে আছে।

একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, 'তুমি নিজে কোনদিন লিখেছ, সোনাদি ?'

আমার যেন কেমন মনে হত সোনাদিও এককালে লেখার চেষ্টা করেছে, নইলে এত কথা জানলে কী করে। আমি লিখি বলে কেন এত খাতির করে !

সোনাদি বললে, 'দূর, আমি লিখতে যাবো কেন ?'

বললাম, 'তবে যে তুমি এত কথা জানো ! কে তোমায় শেখালে ?'

সোনাদি বলতো, 'সব আমার বাবার কাছে শোনা, বাবাকে তুই দেখিস-নি, দেখলে বুঝতে পারতিস কী অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। আমার বাবাও লিখতেন।'

জিগ্যেস করেছিলাম, 'কি লিখতেন, গল্প ?'

সোনাদি বলেছিল, 'বাবা ছিলেন কিষেনগড়ের দেওয়ান। মনে আছে, ঢালু ডেস্কের ওপর কাগজ নিয়ে দিনরাত লিখে চলেছেন—শুধু কি গল্প ? উপন্যাস, ইতিহাস, সাহিত্য—কী নয় ?'

'সে-সব বই কী হল ?'

'সে আর ছাপা হয়নি, বাবা ছাপতে দিতেন না। কিন্তু আমি তো পড়েছি, ছাপলে সে-বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত বাজারে। কিন্তু বাবার ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—তিনি লিখবেন, কিন্তু ছাপা হবে না। হয়ত ছাপাও হত, কিষেনগড়ের দেওয়ানের লেখা ছাপাবার জন্যে রাজার ছাপাখানা সব সময়ই খোলা ছিল। রাজাও বলেছিলেন বাবাকে। আমিও বলেছিলাম। বাবা রাজী হতেন না, বলতেন,—লিখি আমার আত্মবোধের জন্যে, আত্ম-প্রকাশের জন্যে নয়—'

সত্যিই বিলাসপুরে সমস্ত দেখে শুনে আমার তাই মনে হত আত্মবোধ না হলে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা বুঝি বিড়ম্বনা। এতদিন যেন সেই বিড়ম্বনাই করে এসেছি। জগতকে না দেখে এতদিন শুধু বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারি দেখেছি। যার আত্মবোধ হয়েছে, জীবন তার কাছে কত সহজ রূপে ধরা দিয়েছে। যে আত্মরূপ দেখেছে সে বিশ্বরূপ দর্শন করেছে। সেখানে

তর্ক-বিতর্ক নয়, বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়—সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। তার বাহিরও মিলেছে অন্তরও মিলেছে। অন্তর-বাহির, আপন-পর, ভেদ-অভেদ একাকার, একীভূত, একাত্ম হয়ে গেছে তার কাছে।

মনে হত সোনাদি আত্মবোধের দীক্ষা বাবার কাছেই পেয়েছে বুঝি!

তারপর একে একে সবাই ভুলে গেল আমাকে। আমি যে একদিন লিখেছি, তা কয়েক বছর পরে আর কারো মনে থাকবার কথা নয়। আমার লেখক-জীবনের মৃত্যু হল। আমার মুক্তি হল। শুধু একজন ভোলেন নি। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন। লেখা চাইতেন। লিখতেন, 'বিলাসপুরে গিয়ে বিলাসী হয়ে গেলেন নাকি!' আমি কখনও সে-চিঠির উত্তর দিয়েছি, কখনও দেইনি।

একদিন সোনাদি চিঠি লিখলে, 'তুই যে লিখছিস আবার, এখনো যে দশ বছর কাটেনি তোর—'

কিন্তু কই, আমি তো লিখিনি। কিন্তু আমার একজন প্রতিবেশীই আমার ভুল ধরিয়ে দিলেন—

বললেন, 'দেশ' পত্রিকায় আপনার একটা লেখা পড়লাম, বড় ভালো লাগলো।'

বড় লজ্জায় পড়লাম। সত্যি পত্রিকা খুলে দেখি আমিই লিখেছি। সে যে কী লজ্জা কী বলবো! সম্পাদককে চিঠি লিখলাম, 'এ কার লেখা ছাপিয়েছেন আমার নাম দিয়ে?'

তখনো কি জানি এ কেন হল!

সম্পাদক ভয় দেখিয়ে লিখলেন, 'আপনি যদি না লেখেন তো আরো লেখা আপনার নামে ছাপা হবে—'

কিন্তু কেমন করে প্রকাশ করবো—আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সোনাদিকে যে আমি কথা দিয়েছি। দৌড়ে এলাম কলকাতায়। মনে আছে হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা সোনাদির বাড়ি গিয়ে হাজির। কিন্তু এই ক'বছরে এ-বাড়ির ভেতর-বাইরে যে এমন পরিবর্তন হয়ে গেছে তা তো টের পাইনি।

বাড়ির বাইরে বাগানের সে-বাহার নেই। নেই সেই ঘাসের কেয়ারি। নেই যত্ন-লালিত সেই ফুলের বাগান।

সোনাদির ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই কেমন ফাঁকা লাগলো সব। সোনাদির সেই আলমারি-ভর্তি বইগুলোর ওপর ধুলো জমেছে। বিছানাটা তেমনি রয়েছে পাশে। সোনাদির বড় মেয়ে পুঁটু শুয়ে রয়েছে তার ওপর। আর সোনাদির সেই ইজি-চেয়ারটা ফাঁকা। রোজকার মতো সেই পরিচিত দৃশ্য আর নেই এখানে।

অভিলাষ দেখতে পেয়েছে আমাকে।

জিগ্যেস করলাম, 'সোনাদি কোথায় অভিলাষ ?'

অভিলাষ বললে, 'মা তো রান্নাঘরে।'

রান্নাঘরে ! শুনে অবাক্ হলাম। দাশসাহেবের বাড়িতে সোনাদিকে কখনও রান্নাঘরে যেতে দেখিনি। দাশসাহেবের খানসামা বাবুর্চি ছিল। আবার ঠাকুর-চাকরেরও ব্যবস্থা ছিল সোনাদির জন্যে। সোনাদি দু'জনের হাতের রান্নাই খেয়েছে। পার্টিতে যখন বড় বড় ঘরের বউরা মেয়েরা আসতো, সোনাদিকে তাদের সঙ্গে সমান তালে ইংরেজী খানা খেতে দেখেছি, ইংরেজী কেতায় চলতে দেখেছি। শাড়িতে, গয়নায়, কেতা-দুরস্তে সে যেন এক অন্য সোনাদি, আবার যেদিন স্বামীনাথবাবুর বৌবাজারের বাসায় অল্প-পরিসর রান্নাঘরের মধ্যে মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধতে দেখেছি সে-ও এই একই সোনাদি। অথচ সোনাদিকে আমি চিনেছি বলেই সোনাদির চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনও বিরুদ্ধতা পাইনি। কিন্তু দাশ-সাহেবের বাড়িতে এমনিভাবে এমন সময় রান্নাঘরে যাওয়ার ঘটনা সত্যিই চম্‌কে দেওয়ার মতো।

মাঝখানে বিলাসপুর থেকে যখন আর একদিন কলকাতায় এসেছিলাম, সেদিনও এমন ছিল না।

শুনেছিলাম, দাশসাহেব চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক ব্যাঙ্ক খুলেছেন, ব্যাঙ্কের মালিক হয়েছেন। ব্যাঙ্কও খুব ভালো চলেছে।

মনে আছে সে-এক ছুটির দিন। দাশসাহেব পাশে বসে খবরের কাগজ

পড়ছেন, আর পাশের বিছানায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন স্বামীনাথবাবু। তখনও পুঁটুর অসুখ ভালো হয়নি। রতি আর শিশু খেলা করছে বারান্দায়।

দাশসাহেব মুখ তুলে বললেন, 'দেখো সোনা, কে এসেছে ?'

স্বামীনাথবাবু উঁচু হলেন।—'কী খবর হে ?'

আমি দু'জনকেই নমস্কার করলাম।

সোনাদি আমাকে একেবারে পাশে বসালে টেনে। বললে, 'কেমন আছিস ?'

দাশসাহেব বললেন, 'ও একটু রোগা হয়ে গেছে, না সোনা ?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তুমি আমাকে দেখে অবাক্ হয়ে গেছ, না ?'

বললাম, 'তখন শুনেছিলাম আপনি বেশিদিন থাকবেন না ?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'যাওয়ারই তো সব ঠিক ছিল ভাই, ওই দেখো না, দাশসাহেব যেতে দিলেন না।'

দাশসাহেব বললেন, 'অনেকদিন তো চাকরি করলেন আপনি, বিশ্রাম তো করেননি কখনও। একটু না-হয় দিন কতক বিশ্রামই নিলেন।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'আপনার নিজের ব্যাঙ্ক, আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন, আমার হল পরের চাকরি।'

মনে আছে তারপর চা নিয়ে এল অভিলাষ।

দাশসাহেবকে সোনাদির সামনে যেমন দেখতাম, তাঁর ব্যাঙ্কে আবার ছিল অন্যরকম চেহারা। বিরাট ব্যাঙ্ক। বড়সাহেব বলতে ভয়ে কাঁপতো সবাই। দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ঘণ্টার শব্দ হত আর চাপরাসী মহলে ছুটোছুটির পালা পড়ে যেত। সবাই তটস্থ। সে আমি দেখেছি। আর স্বামীনাথবাবুর অফিস আমি দেখিনি, তবে শুনেছি সোনাদির কাছে। সোনাদি বলতো, 'অফিসে গেলে বাড়ির কথা মনে থাকে না ওঁর, আর বাড়িতে এলেও আবার অফিসের কথা ভুলে যান—এমনি মানুষ—'

কিন্তু স্বামীনাথবাবুকে দেখে বোঝা যেত না, অতবড় অফিসটা উনি

চালান কী করে। সেই স্বামীনাথবাবুর নিজের হাতে রাঁধবার দৃশ্যটা যেন ভুলতে পারি না। আর দাশসাহেবের নতুন ছোট শোবার ঘরটায় গিয়েও দেখেছি। স্বামীনাথবাবুকে নিজের ঘরটা ছেড়ে দেবার পর এই ঘরটায় দাশসাহেবের থাকবার ব্যবস্থা হল। গোছান হল খাট, বিছানা, বই, কাগজ, ফাইল। আর দেয়ালে টাঙানো হল সব ছবি। সবচেয়ে বড় ছবিটা ছিল মধ্যেখানের দেয়ালে। ছবিতে পাশাপাশি বসে আছেন দাশসাহেব আর সোনাদি। আর রতি আর শিশু। ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি। মনে হয়েছে ছবিটা দেখে যে-কেউ সোনাদিকে দাশসাহেবের স্ত্রী বলেই ভাববে। কিন্তু যারা সোনাদির সঙ্গে মিশেছে তারা জানে, অতবড় ভুল সোনাদির শত্রুও যদি কেউ থাকে তো তারাও করবে না।

কিন্তু অবাক্ হয়েছিলাম আর-একটা ছবি দেখে। সেটা টাঙানো ছিল স্বামীনাথবাবুর ঘরে। সেটাতেও সোনাদি বসে আছে স্বামীনাথবাবুর পাশে, আর সোনাদির পাশে পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে পুঁটু। ছ'টো ছবিতেই সোনাদি যেন স্ত্রী হয়ে বসে আছে। একই মুখের ভাব, একই চোখের দৃষ্টি, কোথাও কোনো তারতম্য নেই তার।

কিন্তু এবার এ-বাড়িতে পা দিয়ে যেন সব বদলে গেছে মনে হল।

মনে হল, যেখানে যা থাকবার সে যেন নেই।

সোনাদি দাশসাহেবের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করছিল।

আমাকে দেখেই হাসিমুখে বললে, 'কী রে, তোর সোনাদিকে মনে পড়লো!'

বললাম, 'কেমন আছো, সোনাদি ?'

'ভালোই তো আছি, কেন, কী রকম দেখছিস ?'

ভালো করে সোনাদিকে চেয়ে দেখলাম। কোথাও ও-চেহারায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি! মুখের হাসির ভাষা কি কিছু কম মুখর, চোখের দৃষ্টির রং কিছু কম উজ্জ্বল! কোথাও তো টের পাচ্ছি না! সোনাদি উনুনের ডেক্‌চি নামিয়ে কড়া তুললে।

খানিক পরে বললাম, 'সোনাদি, তুমি রাঁধছো ?'

'কেন আমি রাঁধতে পারিনে?' বলে উনুনের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল সোনাদি।

তবু যেন আমার ভয় গেল না।

বললাম, 'সত্যি বলো না, কী হয়েছে?'

'হবে আবার কী রে, পাগল ছেলে!'

'কিছু হয়নি—সত্যি? তবে খানসামা, বাবুর্চি, পীরালি, সুখ সিং, ঝি-রা, বামুনঠাকুর সব কোথায় গেল, কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে যে!'

'ওঃ, তাই বলছিস! তাদের তো ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! কেন?'

'কেন আবার, দাশসাহেবের ব্যাঙ্ক যে ফেল্ হয়েছে, শুনিস নি?'

আমি যেন ভুল শুনছি। আমার মনে হল যেন স্বপ্ন দেখছি চোখ মেলে।

সোনাদি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'ট্রেন থেকে নেমে সোজা আসছিস নাকি!'

আমি কিছু উত্তর দিতে পারলাম না।

আবার জিগ্যেস করলাম, 'তাহলে কী হবে সোনাদি?'

'কী আবার হবে?' বলে সোনাদি আপন মনে রান্নাই করতে লাগলো।

বললাম, 'সোনাদি, কথা বলো না?'

সোনাদি আমার পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তারপর তেমনি রান্না করতে করতেই বললে, 'কী কথা বলবো, বল?'

মনে আছে এখনও, কী ভীষণ সে দিন ক'টা। দাশসাহেব নিজের বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছেন। মুখে কোনো কথা নেই। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে। কত লোক আসছে দেখা করতে, কারো সঙ্গে দেখা করছেন না দাশসাহেব। অভিলাষ বলতো, 'দেখা হবে না দাশসাহেবের সঙ্গে, সাহেবের অসুখ।'

তারপর কত কী ঘটলো। সে কী ভীষণ অসুখ দাশসাহেবের! ব্লাড-প্রেসার ছিলই, তারপর কেমন হল, আর বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে পারেন

না। সোনাদি তার ওই দুর্বল শরীর নিয়ে পাশে বসে চামচে করে খাইয়ে দেয়। বলে, 'এইটুকু খেয়ে নাও—'

দাশসাহেব চুপ করে খেয়ে নেন। কিছু কথা বেরোয় না তাঁর মুখ দিয়ে। চুপ করে সব দেখেন। চোখের সামনে একে একে সকলকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল।

অভিলাষকে ডেকে সোনাদি বললে, 'অভিলাষ, সাহেবের অবস্থা তো দেখছ, তোমাকে মাইনে দিতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না।'

অভিলাষ তবু যেতে চায় না। বলে, 'অনেক নুন খেয়েছি সাহেবের, আমাকে আর তাড়িয়ে দেবেন না, মা।'

রতি আর শিশুও একদিন ইস্কুল ছেড়ে চলে এল। সেখানেও গঞ্জনা শুনতে হবে সকলের কাছে। খবরের কাগজেও খবরটা বেরিয়ে গেছে। এক হাজার দু-হাজার টাকার ব্যাপার নয়, লাখলাখ টাকার কারবার। সব বন্ধ! সোনাদি রান্নাবান্না সেরে রতি আর শিশুকে নিয়ে পড়াতে বসে। বলে, 'এবার থেকে আমি নিজেই তোমাদের পড়াবো।'

আমি চুপ করে শুনি, দেখি সব। কী চমৎকার সোনাদির পড়ানো। কী চমৎকার সোনাদির ইংরিজী উচ্চারণ। আর সেই হাসিমুখ। সেই হাসিমুখেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সোনাদির সংসারের কাজ। কাজ করতে ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই! টেলিফোনের লাইনটা একদিন এসে কেটে দিয়ে গেল কোম্পানির লোকেরা। মোটরগাড়িটা ক্রোক্ করে নিলে। পুলিস দাশসাহেবকে কী সব জিগ্যেস করলে। অ্যারেস্ট করে জামিনে খালাস করে দিয়ে গেল। সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিলে। নিঃস্ব নিরাভরণ বাড়িঘর। সোনাদি একটা একটা করে গয়না খুলে দিতে লাগলো। শুধু সোনাদি আর অভিলাষ! আর তিনটি শিশু—দাশসাহেব, রতি আর শিশু।

আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম, আরো একমাস বাড়িয়ে ছুটির দরখাস্ত করে দিলাম।

আমি জিগ্যেস করতাম, 'কতদিন এমনি করে চলবে, সোনাদি?'

সোনাদি তেমনি হাসতো। বলতো, 'চালাবার মালিক কি আমি, আমায় যে জিগ্যেস করছিস ?'

'তোমাকে জিগ্যেস করবো না তো কাকে জিগ্যেস করবো আমি ?'

সোনাদি দাশসাহেবের ভাত বাড়তে বাড়তে বলতো, 'এতদিন যেমন করে চলেছে, তেমনি করেই চলবে।'

ওদিকে পুলিস আসে, লোকজন আসে, সোনাদি তাদের সঙ্গে কথা বলে। কী স্পষ্ট, কী ভদ্র, কী শান্ত ব্যবহার। দাশসাহেবকে আড়ালে রেখে সোনাদি এগিয়ে আসে সামনে। আড়াল করে রাখে রতিকে শিশুকে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয় না। কিন্তু বুঝতো সবাই। আস্তে আস্তে সোনাদির সমস্ত দেহ নিরাভরণ হয়ে আসে। তবু সোনাদির মুখের হাসি তেমনি অম্লান।

মনে আছে তখনো কতদিন, যখনি অবসর হয়েছে, সোনাদি ইজি-চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে গল্প করেছে। সেদিন সকাল-সকাল সোনাদির বাড়ি গেছি, হঠাৎ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল একটা ট্যাক্সি আর নামলেন স্বামীনাথবাবু।

সোনাদি বললেন, 'তুমি ?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'খবরের কাগজে সব দেখলাম, তা দাশসাহেব কোথায় ?'

সোনাদি বললে, 'ওই ঘরে দেখো গে, শরীর খারাপ ওঁর, বড় মন-খারাপ হয়ে গেছে।'

স্বামীনাথবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কেন এমন হল হঠাৎ ?'

সোনাদি বললে, 'কেন হল তা কি আমি জানি ? আগের দিনও অফিসে গেছেন, টেলিফোন করেছেন, যেমন রোজ খান তেমনি ছ'শ্লাইস ব্রেড আর টোম্যাটোর সস্ খেয়েছেন, বিকেল তিনটের সময় টেলিফোন এল, বললেন, 'আমার বাড়ি যেতে একটু দেরি হবে—'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তারপর—'

সে গল্প সোনাদি আমাকেও বলেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারে লোকে

লোকারণ্য। হাজার হাজার লোক ব্যাঙ্কের সামনে চীৎকার করছে। ব্যাঙ্কের কোল্যাপসিব্‌ল গেট বন্ধ করে দিয়েছে। কত লোক সেই দেয়ালের পাথরের ওপরই মাথা কুটছে। দাশসাহেব আট্‌কে পড়লেন অফিসের কামরায়। তারপর টেলিফোন করলেন সোনাদিকে।

সোনাদি টেলিফোন ধরে বললে, 'বাড়ি চলে এসো এখুনি।'

'এখন যাওয়া অসম্ভব, ওরা সমস্ত রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে বেরোতে দেবে না—সমস্ত রাস্তা বন্ধ।'

সোনাদি বললে, 'আমি যা'চ্ছি এখুনি, গাড়িটা পাঠিয়ে দাও।'

'তুমি এসো না সোনা, তোমাকেও এরা বাধা দেবে, আসতে দেবে না।'

'তবে আমি ট্যাক্সি করে যাচ্ছি' বলে টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে উঠলো সোনাদি।

সোনাদি বললে, 'দাশসাহেবকে কি বা'র করে আনতে পারি সেদিন, হাজার হাজার লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, আমি ট্যাক্সি থামিয়ে সোজা ভিড় ঠেলে গিয়ে উঠলুম, তারপর কেমন করে যে দাশসাহেবকে নিয়ে আবার বাড়িতে এলুম, তা আমিই জানি। কিন্তু সেদিন রাত্রেই দাশসাহেব বিছানায় পড়লেন, দেখে এসো গিয়ে, আর উঠতে পারেন না, আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে হয়—'

তারপর সে-ক'দিন স্বামীনাথবাবু কী পরিশ্রমই করলেন। যে-ক'দিন ছিলাম সেবার, দেখেছি স্বামীনাথবাবু সারাদিন কোথায় কোথায় যান। উকীল, ব্যারিস্টার, অ্যাটর্নি, সলিসিটর। জলের মতো টাকা খরচ করেন। ঝি-চাকর যাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার রাখা হল। সুখ সিং আবার এসে গেট-এ দাঁড়ালো। সোনাদির পুরনো ঝি-রা আবার এল। স্বামীনাথবাবু নিজের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুললেন। সারাজীবনে যা কিছু জমিয়েছেন পুঁটুর বিয়ের জন্যে, কলকাতায় বাড়ি করবার জন্যে কয়েক হাজার টাকা আলাদা করা ছিল, তা-ও সব তুলতে হল।

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'ঠিক আগে যেমন ছিল, তেমনি চলুক, কোথাও যেন ত্রুটি না থাকে।'

আমিও উকীল ব্যারিস্টারের বাড়ি ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। একা স্বামীনাথবাবু কত পারবেন।

দাশসাহেব বিছানায় শুয়ে বললেন, 'সলিসিটররা কী বলেছে?'

'সে সব আপনি ভাববেন না, আমি তো আছি—'

তারপর যখন সারাদিনের কাজের পর স্বামীনাথবাবু বাড়ি আসেন, তখন টেবিলে গোল হয়ে বসে আবার সভা হয়। আসর আবার জমে।

সোনাদি বলে, 'পুঁটু, খাচ্ছো না তো?'

পুঁটু মুখ কাঁচু-মাচু করে বলে, 'ক্ষিদে পাচ্ছে না যে মা?'

স্বামীনাথবাবু বলেন, 'আজকেও আবার পেয়ারা খেয়েছে বোধহয়?'

সোনাদি জিগ্যেস করে, 'কতদিনের ছুটি নিলে তুমি?'

স্বামীনাথবাবু বলেন, 'এ-ব্যাপারটা না মিটলে তো আর যেতে পারি না।'

সোনাদি আবার জিগ্যেস করে, 'নয়ন কী রকম কাজ করছে ওখানে?'

'ও বলছিল, আর দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে—'

'আর দুধটা দেখে নেওয়া হয় তো এখনো?'

'সব তো শনিচরীর-মা করে, ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'পুঁটু তো লেখাপড়া কিছু পারে না, দ্বিতীয় ভাগের বানানও সব ভুলে বসে আছে।'

'পুঁটুকে তুমি তোমার কাছেই রাখো এখানে।'

এক-একদিন স্বামীনাথবাবু এসে জিগ্যেস করেন, 'দাশসাহেব কেমন আছেন আজ?'

'সেই রকমই।—কিছু সুরাহা হল?'

স্বামীনাথবাবু জামা ছাড়তে ছাড়তে বলেন, 'সুরাহা হবে বলেই তো যেন মনে হচ্ছে এবার।'

'সলিসিটরকে কত টাকা দিলে আজ?'

'আগে যা দিয়েছিলাম 'তার পরে আজকেও আবার চেক্ দিলাম।'

'কতদিন আর চলবে কেস্?'

'যত বছরই লাগুক, চালিয়ে তো যেতেই হবে।'

'আর কতদিন এখানে থাকবে ?'

'ছুটি আরো বাড়িয়ে নিয়েছি, তা জব্বলপুরের বাড়িটার জন্যে একটা পার্টি এসেছিল আজ—'

'কত দর দিতে চায় ?...'

তা আমি বেশিদিন থাকতে পারিনি সেবার। দাশসাহেবের মামলা তখনও চলছে। বিলাসপুরে এসে আবার চাকরিতে যোগ দিয়েছি। সোনাদিকে চিঠি দিয়েছি। ঠিক ঠিক জবাব এসেছে প্রত্যেকবার। প্রত্যেক-বারই সোনাদি লিখেছে, 'লেখার কথা ভুলে যাসনি তো ?'

লেখার কথা কি ভুলতে পারি! পাঠকরা আমাকে ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি তাদের। যুদ্ধের বাজারে কত রকম পত্রিকা বেরোলো। কত নতুন প্রতিভাকে নিয়ে মাতামাতি হল। আমি তবু ভুলিনি। আমি ভুলিনি আমার সোনাদির কথা। সোনাদিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। আমি জানি আমার পথ সামনে, আমার পথ অদূরে। আমার মধ্যে সংশয়রহিত আমি। আমি সেই একটি একককে পেয়েছি। একেবারে রসরূপে, আনন্দরূপে, অব্যবহিতভাবে পেয়েছি। এ জানা নয়, সংগ্রহ নয়, জোড়া-তালি দেওয়া নয়—এ প্রকাশ। সূর্যের প্রকাশের মতো ভাস্বর। সে-প্রকাশকে খুঁজতে বাইরে যেতে হবে না। কারো দরজায় গিয়ে খোসামোদ করতে হবে না। হাটে বাজারে গিয়ে খুঁজতে হবে না। শুধু অন্তরের জানালা-দরজাগুলো খুলে দিলেই সে-আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে উদ্ভাসিত হবে। সোনাদি আমাকে দিনের পর দিন সেই দীক্ষাই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, সোনাদিই তা দেখতে পেলে না। সোনাদিকেই দেখাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত, এ-ক্ষোভ আমার রাখবার জায়গা নেই।

একদিন হঠাৎ স্বামীনাথবাবুর চিঠি পেলাম। লিখেছেন, 'সোনাদি তোমায় দেখতে চেয়েছে একবার, চলে এসো শিগ্‌গির।'

কী জানি চিঠি পেয়ে বড় উৎকণ্ঠা হল। ছুটে এলাম কলকাতায়।

মনে আছে, সোনাদির আগের চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম—দাশ-

সাহেব মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু সে-মুক্তির মানে যে কী, তা আমি আন্দাজ করতে পারতাম। দাশসাহেবের মুক্তির জন্যে স্বামীনাথ-বাবু জীবনের যা-কিছু সঞ্চয় যা-কিছু সামর্থ্য সমস্ত ব্যয় করেছেন। জব্বলপুরের বসতবাড়িটাও বাঁধা দিয়েছেন। এমন কিছু ছিল না, যা দেননি। প্রয়োজন হলে বাকী সবকিছুই তিনি দিতে পারতেন। তারপর যখন সমস্ত দিকে সুরাহা হয়েছে, দাশসাহেব সেরে উঠেছেন, আবার ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, আবার সোনাদি যখন স্বামীনাথবাবুর কাছে জব্বলপুরে ফিরে যাবার কথা ভাবছে—এমন সময় এমন কী কাণ্ড ঘটলো!

গিয়ে দেখলাম—সমস্ত বাড়িতে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া! তবু বাগানের চেহারা আবার ফিরেছে। গেট-এ সুখ সিং দাঁড়িয়ে ছিল। সেলাম করলে আমায়। বললে, 'মাঈজীর বড় বেমার—'

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সোনাদির ঘরে। সোনাদি শুয়ে ছিল। যেন চিনতে পারলে আমাকে। যেন হাসলো। যেন দৃষ্টি দিয়ে কাছে ডাকলে। কাছে গেলাম। দাশসাহেব মাথার কাছে বসেছিলেন। এ-পাশে স্বামীনাথ-বাবু দাঁড়িয়েছিলেন শুক্‌নো মুখে। আর, একজন ডাক্তার কী যেন লিখছিলেন একটা কাগজে।

ওষুধে-পত্রে ছেয়ে গেছে টেবিল।

সেদিনের সব কথা আজ আর বলবার দরকার নেই। সব কথা আমি ছাড়া আর কারো হয়ত মনেও নেই। তবু মনে আছে যখন সব শেষ হয়ে গেছে, তখন স্বামীনাথবাবু শান্ত-স্নিগ্ধ চোখে সোনাদির প্রাণহীন দেহটার দিকে উদার দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কিন্তু দাশসাহেবের অবস্থা বড় করুণ। ছেলেমানুষের মতো আছড়ে-পিছড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে সবাই মিলে ধরেও থামানো যায় না এমনি অবস্থা তাঁর।

মনে আছে স্বামীনাথবাবু বলেছিলেন, 'দাশসাহেব বড় কাতর হয়ে পড়েছেন—ওঁকে তুমি দেখো—'

দাশসাহেবও মনে আছে বলেছিলেন, 'স্বামীনাথবাবুর কাছে গিয়ে একটু বোসো ভাই তুমি, ওঁর শোকটাই দারুণ—'

আর আমি !

স্বামীনাথবাবু এখনও জব্বলপুরে। দাশসাহেব সেই ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার পর আর-একটা ব্যাঙ্ক করেছেন কলকাতায়। তাঁদের সঙ্গে আমার আর কোনও যোগাযোগ নেই আজ। তাঁরা কী পেয়েছিলেন জানি না। দু'জনের ঘরে গিয়েই দেখেছি দুটো বড় বড় ছবি। একটা ছবিতে দাশসাহেবের সঙ্গে সোনাদি, আর একটা ছবিতে স্বামীনাথবাবুর সঙ্গে। কতবার ভেবেছি, সোনাদির কাছে কে সব চেয়ে প্রিয় ছিল! স্বামীনাথবাবু, দাশসাহেব, না আমি! আমার কথা ওঁরা দু'জনেই হয়ত কখনো ভাবেননি। কিন্তু ওঁরা যা পেয়েছেন, তার চেয়ে যে কত বেশি পেয়েছি আমি। আমার পাওয়ার যেন শেষ নেই! আমি যে আশাতীত পেয়েছি। সোনাদিকে পেয়েও পেয়েছি, হারিয়েও পেয়েছি। জীবনের মধ্যে দিয়ে পেয়েছি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। এই যে আজ অন্তরের সঙ্গে বাইরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করতে পেরেছি—এ তো সোনাদিরই শিক্ষা!

আজ আমার জীবনে অন্তর মিলেছে, বাহির মিলেছে, সুখ মিলেছে, দুঃখও মিলেছে। শুধু যে জীবন পেয়েছি তা নয়, মৃত্যুও পেয়েছি। শুধু বন্ধুই নয়, শত্রুও পেয়েছি। তাইতো আমার জীবনে ত্যাগ আর ভোগ দুই-ই পবিত্র, লাভ আর ক্ষতি দুই-ই সার্থক। সমস্ত সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, বিরহ-মিলনের সার্থকতা আমার জীবনে নিটোল হয়ে একটি অখণ্ড প্রেমের পরিপূর্ণতায় এক হতে পেরেছে। প্রশংসাও যেমন পেয়েছি, নিন্দাও পেয়েছি তেমনি। তবু আমার প্রাপ্য বলে আমি দু'টিকেই গ্রহণ করেছি। আমি বলতে পেরেছি, সমস্ত লোক-লোকান্তরের ঊর্ধ্বে নিস্তব্ধ-বিরাজমান্ হে পরম-এক, তুমি আমার মধ্যে এসে আমার হও!'

তারপর আমার অজ্ঞাতবাসের পালা শেষ হল একদিন। মনে আছে আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। এবার অনেক দূরের যাত্রা! এবার বৃহতের দিকে আমার লক্ষ্য। আমি স্থিতধী হয়েছি। সোনাদি আমায়

সত্যদৃষ্টি দিয়ে গেছে। আমার তৃতীয় নেত্র খুলেছে। আমি নতুন করে জন্ম নিলাম। আমার নতুন উপন্যাসের সেই হল গোড়াপত্তন। আগেকার সব লেখা বাতিল হয়ে গেল। সোনাদির সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের একটা অধ্যায়ের এখানেই পড়লো পূর্ণচ্ছেদ।